গ্রাহক ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত, অক্টোবর ১৯৬২

প্রহেলিকা সিরিজ—৫০

# অদৃশ্য বিচারক

নীলচোখের সংকেত, কাজলগড়ের কাহিনী, নিয়তির দূত, প্রাণ নিয়ে খেলা
প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা

শ্রীমুরারি মোহন বীট
প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

"স্নেহের লক্ষ্মণকে"

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরপাড়া – হুগলী

২৬/২/৬৪

# অদৃশ্য বিচারক

কেন ?

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি কোনও একটা দিন। সময়ঃ সন্ধ্যারাত। সাড়ে সাতটা। আকাশের গায়ে একফালি
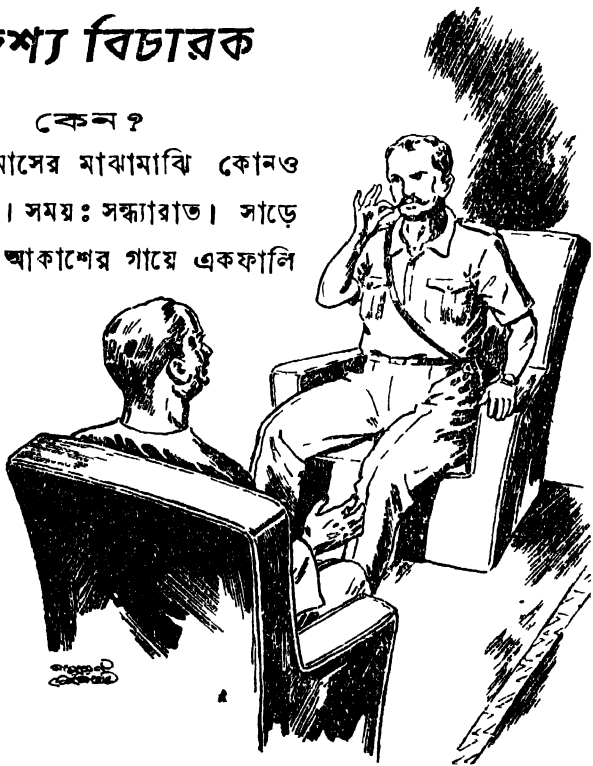
সরু চাঁদ। সুদক্ষ শিল্পীর হাতে উজ্জ্বল সোনালী রং দিয়ে যেন নিখুঁত ভাবে আঁকা। ওর মৃদু আলো যে কোন পল্লীগ্রামের বুকে স্বপনরাজ্য সৃষ্টি করলেও কলকাতা মহানগরীর বৈদ্যুতিক আলো, গগনচুম্বী অট্টালিকা, গাড়ি-ঘোড়া, আর জনস্রোতের জাঁক-জমকের

মাঝে ওর ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ! তবুও আকাশের দিকে চাইলে ভাল লাগে। বেশ ঠাণ্ডা একফালি বাঁকা আলো। বেশ মিষ্টি আলোটা। এই ভালো লাগাকে আরও গভীর ভাবে উপলব্ধি করবার জন্যই বোধ করি অসীম চ্যাটার্জী তাঁর অট্টালিকার অন্ধকারময় নির্জন ছাদের এক কোণে দাঁড়িয়ে চাঁদটার দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর একটু তফাতেই প্রবীর ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট ফুঁকছে।

অসীম চ্যাটার্জীর অন্তরঙ্গ বন্ধু হল প্রবীর চৌধুরী এবং তাঁর গোয়েন্দাজীবনের সুদক্ষ সহকারী। মাসের মধ্যে প্রায় বিশ দিন প্রবীর বন্ধুর কাছে এখানেই থাকে। ওদের বাড়ি রসা রোডে। সেখানে ওর মা-বাপ, ভাই-বোন সকলেই আছেন।

খানিকক্ষণ পর চ্যাটার্জী অন্যমনস্কভাবে বললেন,—চাঁদটা কী সুন্দর দেখতে! তারাগুলোর মাঝে বেশ দেখাচ্ছে! একচ্ছত্র সম্রাট্ যেন!

প্রবীর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো,—ওই চাঁদ শিবের মাথায় থাকে।

—হুঁ!

এমন সময় বালক-ভৃত্য আনন্দ এসে সংবাদ দিল,—বাবু, ইনিসপেকটার সাহেব এসেছেন দেখা করতে।

চ্যাটার্জী তিরস্কার করে উঠলেন,—আবার বাবু বলে ডাকছিস? তোকে কতদিন না বলেছি, আমাকে বড়দা আর

প্রবীরকে ছোড়দা বলে ডাকবি ? মনে থাকে না কেন ? আর যেন ভুল না হয় কোনদিন !

আনন্দ সলজ্জে ঘাড় নাড়ে। ভুল অবশ্য তার হয় না। বড় লজ্জা হয় ওই সম্বোধনে ডাকতে। যে মনিব, মাসে মাসে যাঁর কাছ থেকে সে মাইনে নেয়, তাঁকে বড়দা বলে ডাকা যায় কেমন করে ?

চ্যাটার্জী বললেন,—ইন্‌সপেকটরবাবুকে বসতে বলগে ; আমি যাচ্ছি।

প্রবীরকে সঙ্গে নিয়ে চ্যাটার্জী নীচেকার ড্রইংরুমে এসে উদয় হলেন। ড্রইংরুমের পৃথক পৃথক দুটি সোফায় বসে ছিলেন ডিটেকটিভ ইন্‌সপেকটর শ্রীঅনাদি মিত্র এবং দারোগা শ্রীকরুণা সেন। এঁরা উভয়েই লালবাজার থানার কর্মচারী। চ্যাটার্জী হাসিমুখে শুধোলেন,—কী খবর ?

অনাদি মিত্র বললেন,—একটা খুন হয়ে গেছে কাশীপুর রোডে।

—কখন ?

—পরশু রাত্রে। কিন্তু এর মধ্যে ভাববার বিষয় হল এই যে, খুন হয়েছে একটি চাকর। চাকরটা ঘরের মধ্যে ঘুমুচ্ছিল, এমন সময় জানলার গরাদে বেঁকিয়ে আততায়ী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে কোন ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে গলাটা কেটে ধড় থেকে আলাদা করে দিয়েছে !

—ওঃ! ভয়ংকর ব্যাপার তো ? কিন্তু হঠাৎ একটা

চাকর খুন হতে গেল কেন? চাকরে আবার অপরাধ করলো কি?

মিত্র বললেন,—ভাববার বিষয় তো এইখানেই! চাকরটার সাধারণ পরিচয় শুনুন। ক্যানিং স্ট্রীটের বৃদ্ধ বিজয় অধিকারী কয়েক লক্ষ টাকার মালিক। তিনি বর্তমানে কাশীবাসী। তাঁরই একমাত্র পিতৃ-মাতৃহীন নিঃসহায় ভাইপো সঞ্জয় অধিকারী কাশীপুর রোডে একটি মাত্র চাকর নয়নকে নিয়ে বাস করেন। কাজ করেন গান্-শেল ফ্যাক্টরিতে। পরশুদিন সঞ্জয়বাবু নাইট শোতে সিনেমায় গিয়েছিলেন, বাড়ি ফিরে দেখেন ওই কাণ্ড!

—হুঁ! তারপর?

—আজ কমিশনার সাহেব এই কেসটার তদন্তভার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন—ভার পড়েছে আমার ওপর। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি, এটা একটা সুচিন্তিত জটিল হত্যাকাণ্ড! নচেৎ সামান্য একটা চাকর খুন হতে যাবে কেন? কাশীপুর থানা থেকে রিপোর্টও এসেছে, ঘরের জিনিসপত্রে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ছিল না। এবং সঞ্জয়বাবু নিজে পরীক্ষা করে দেখেছেন, ঘরের কোন জিনিসই নষ্ট হয়নি! অবশ্য এসম্বন্ধে আমাদের পুনরায় এনকোয়ারি করতে হবে।

চ্যাটার্জী সব শুনে বললেন,—যাই হোক, এখন কী বলতে চান আপনি?

এতক্ষণে দারোগা করুণা সেনের বাক্যস্ফূর্তি হল। বললেন, —আমরা এসেছি আপনার সাহায্য পাবার আশায়।

মিত্র বললেন,—খুনের ধরন দেখে বুঝতেই তো পারছেন, কিরকম ভয়ানক খুনী! তার ওপর কেসটাও অত্যন্ত ডিফিকাল্ট্ বলে বোধ হচ্ছে। এক্ষেত্রে আপনার সাহায্য না পেলে অন্ধকারে ঘুরপাক খাওয়া ছাড়া—শুধু তাই নয়, বিপাকে পড়ে বিপদে জড়িয়ে পড়াটাও আশ্চর্য নয়!

চ্যাটার্জী খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন,—কিন্তু আমার এই অনধিকার চর্চায় কমিশনার সাহেব বিরক্ত হতে পারেন?

মিত্র বিস্ময়ে বললেন,—কী বলছেন আপনি? আপনার সাহায্য নিলে বিরক্ত হবেন কমিশনার সাহেব! তাহলে আপনি এখনও চিনতে পারেননি তাঁকে। আপনি বেসরকারী ডিটেকটিভ হলেও আপনার মতো একজন ডিটেকটিভ বাঙলা দেশে আছে বলে তিনি যথেষ্ট গর্ববোধ করেন। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, আপনার কথা আমি বলেছিলাম কমিশনার সাহেবকে। তিনি সোৎসাহে আমাকে বলেছেন, যে কোন লোকের সাহায্য নিতে পারি আমি!

চ্যাটার্জী বললেন,—বেশ, আপনাকে আমি সাধ্যমত সাহায্য করব। উপস্থিত আমার হাতে বিশেষ কোন কাজ নেই। তবে আমার শর্তটা কি জানেন তো? আমি যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি, সে ক্ষমতা আমাকে দিতে হবে। এবং কারও কাছে কোনও কৈফিয়ত দিতে আমি বাধ্য থাকবো না। স্বেচ্ছায় সময়মতো সব বলবো।

মিত্র বললেন,—এসব কথা বলে মিছামিছি আমাকে লজ্জা

দিচ্ছেন মিস্টার চ্যাটার্জী! আমি আপনার শিষ্য। আপনার কাছে আমার গোয়েন্দাগিরি শিক্ষা। গোয়েন্দা হিসেবে আজ আমি যেটুকু নাম পেয়েছি, সে শুধু আপনার জন্যই। অথচ আমি প্রায়ই লক্ষ্য করি, এরকম কথা বলে আমাকে লজ্জা দেওয়াটা আপনার যেন অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে!

—বাপ্‌স্‌! আপনিও দেখছি লজ্জা দিতে কম নন!…… যাক, এখন কী কর্তব্য আমার?

মিত্র বললেন,—এনকোয়ারির প্রয়োজন তো? সঞ্জয়বাবু এখন ক্যানিং স্ট্রীটে বিজয়বাবুর বাড়িতেই রয়েছেন। বড় ভয় পেয়ে গেছেন ভদ্রলোক। কাশীপুরের বাড়িতে একা থাকতে আর সাহসে কুলোচ্ছে না তাঁর। কাজেই আমাদের যেতে হবে ক্যানিং স্ট্রীটে।

চ্যাটার্জী শুধোলেন,—ক্যানিং স্ট্রীটের বাড়িতে কে কে থাকেন?

—শুনেছি বিজয়বাবুর দুই ছেলে থাকেন। এ ছাড়া আর কিছু জানি না।

—বেশ, একটু অপেক্ষা করুন; জামা-কাপড়টা পালটে আসি।

অল্প সময়ের মধ্যেই চ্যাটার্জী প্রস্তুত হয়ে এলেন। প্রবীরও এলো সঙ্গে। প্রবীরকে দেখে অনাদিবাবু সানন্দে বললেন,—এই যে মিস্টার চৌধুরীও প্রস্তুত দেখছি! আপনিও যাবেন তো সঙ্গে?

প্রবীরের কিছু বলবার আগেই চ্যাটার্জী বললেন,—প্রবীর সঙ্গে না থাকলে আমি কোন কাজেই আনন্দ পাই না মিস্টার মিত্র। আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি, তখন থেকে প্রবীরের সঙ্গে

আমার প্রথম অন্তরঙ্গতা শুরু হয়। এবং তারপর থেকেই কোন কাজে একে সঙ্গী হিসেবে না পেলে সে কাজে আমি তৃপ্তি পাই না।....যাক, উঠুন।

গাড়িবারান্দার নীচে অনাদিবাবুর গাড়িখানা দাঁড়িয়ে ছিল। প্রত্যেকে একে একে গাড়িটিতে আরোহণ করলেন। ড্রাইভারের আসনে বসলেন অনাদিবাবু নিজে।

সদর ফটক দিয়ে বেরিয়ে গাড়িখানা ছুটে চলে পালিশকরা রাজপথের ওপর দিয়ে। চ্যাটার্জী এক সময় বললেন,—জানেন মিস্টার মিত্র, আমি ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে আকাশের চাঁদের সৌন্দর্য দেখছিলাম। কিন্তু ওই সৌন্দর্যের ওপিঠে যে মানুষের তাজা রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে, সেটা বুঝে উঠতে পারিনি! বুঝে উঠতে পারিনি বলেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম ওই একফালি ঠাণ্ডা আলোর মোহে! এখন ওই চাঁদটাকে কী মনে হচ্ছে জানেন? যেন ওটা শান দেওয়া একটা চকচকে ধারালো কাস্তে! এক কোপে একটা মানুষের মুণ্ডু উড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে ওটা যথেষ্ট!

প্রবীর বললো,—কী তুমি যা-তা বকছো অসীমদা?

চ্যাটার্জী শুকনো একটু হেসে বললেন,—যা-তা বকছি না প্রবীর, আমার মাথা খুব ঠাণ্ডাই আছে। আমি কী ভাবছি জানো? কেন এ বিষাক্ত পৃথিবী ধ্বংস হয় না? প্লাবনে, ভূমিকম্পে, মহামারীতে সব ছারখার হয়ে যাক!

চুপ করলেন চ্যাটার্জী।

আর কেউ কোন কথা বলতেও সাহস পেলেন না।

## প্রশ্ন

বিজয় অধিকারীর ছোট্ট তিনতলা বাড়িটার সামনে গাড়ি থামতেই ভৃত্য রতন সর্বপ্রথম অভ্যর্থনা জানালো। রতন জানে এসময় থানা থেকে তাঁদের আসবার কথা। বড়বাবুই একথা তাকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং সেই কারণেই সে অপেক্ষা করছিল নীচে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে চ্যাটার্জী প্রশ্ন করলেন, —তুমি কি এখানে কাজ করো ?

সপ্রতিভ ভাবে রতন উত্তর দেয়,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—নাম কী তোমার ?

—আজ্ঞে রতন বাড়ুই।

—এখানে কাজে লেগেছো কতদিন ?

—তা বছর দশেকের ওপর হবে বাবু।

—বটে! বহুদিন ধরে কাজ করছো তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কথা বলতে বলতে ওঁরা দ্বিতলে পৌঁছালে দ্বিতীয়বার অভ্যর্থনা পেলেন বিজয়বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র হরপ্রসাদ এবং হরপ্রসাদের ডাক্তার বন্ধু শচীন দাসের কাছ থেকে। অতঃপর চ্যাটার্জী হরপ্রসাদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করে ওঁদের সংসার সম্বন্ধে যে খবরটুকু সংগ্রহ করলেন, তা মোটামুটি এই :

বিজয়বাবু লোহার কারবার করে আজ কয়েক লক্ষ টাকার মালিক। তাঁর বর্তমান বয়স প্রায় পঞ্চান্ন। তাই আর সংসারের ঝামেলায় নিজেকে না জড়িয়ে তীর্থপর্যটনে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবেন বলে মনস্থ করেছেন। এবং সেই সৎ উদ্দেশ্যেই মাস ছয়েক হল তিনি কাশীবাসী। কাশীতে বছরখানেক কাটিয়ে তারপর যাবেন বৃন্দাবন। সঙ্গে নিয়ে গেছেন একটি মাত্র চাকর। সে-ই তাঁর সবকিছু দেখাশুনা করে। তাঁর স্ত্রী পুষ্পা দেবীর মৃত্যু হয়েছে অনেক দিন।

বর্তমানে তাঁর লোহার কারবার দেখাশোনা করছেন হরপ্রসাদ। বিয়ে-থাওয়া করে হরপ্রসাদ সংসারী হয়েছেন। ছোট ছেলে শশাঙ্ক কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র।

আর একজন—সে হল সঞ্জয়। বিজয়বাবুর একমাত্র পিতৃ-মাতৃহীন ভাইপো এই সঞ্জয়। বিজয়বাবু একে যথেষ্ট স্নেহ করেন—নিজের ছেলের মতো। গান্-শেল ফ্যাক্টরিতে বেশ মোটা মাইনের কাজ করে সঞ্জয়। ওর মা মারা গেছেন অনেকদিন—বাপ গেছেন বছর পাঁচেক হল। বাপের মৃত্যুর পর বিজয়বাবু চেয়েছিলেন ওকে নিজের কাছে রাখতে। কিন্তু সঞ্জয় রাজী হয়নি। নিজের ভিটের মমতা! তাছাড়া ক্যানিং স্ট্রীট্ থেকে গান্-শেল ফ্যাক্টরিতে রোজ কাজে যাওয়া কম অসুবিধা নয়! সাত-সমুদ্দুর-তেরো-নদী পেরিয়ে সে এক তেপান্তরের মাঠ!

চ্যাটার্জী আরও জানলেন যে, বিজয়বাবু তাঁর স্থাবর অস্থাবর

সমস্ত সম্পত্তি সমান তিনভাগে উইল করে দিয়েছেন হরপ্রসাদ, শশাঙ্ক, আর সঞ্জয়ের নামে।

এক সময় সঞ্জয়কে গোপনে ডেকে চ্যাটার্জী শুধোলেন,—নয়নের মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার কী অভিমত ?

কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে সঞ্জয় বোকার মতো চ্যাটার্জীর মুখের দিকে তাকায়। চ্যাটার্জী আবার বললেন,—অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে, নয়ন কেন এভাবে খুন হল, এ সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে আপনার ?

—হ্যাঁ আছে।

সঞ্জয় বেশ গম্ভীরভাবেই কথাটা বললো।

—কী, বলুন ?

একটু থেমে নিয়ে সঞ্জয় বললো,—আমার নিজের ব্যক্তিগত ধারণা, খুনী নয়নকে খুন করতে চায়নি—চেয়েছিল আমাকেই খুন করতে! সেই জন্যেই বড্ড বেশী ভয় পেয়ে গেছি আমি! আর আমার সাহস হচ্ছে না একা কাশীপুরে থাকতে।

চ্যাটার্জীর ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। শুধোলেন,—আপনার এরূপ ধারণার কারণ কি ? বেশ খোলাখুলিভাবে আমাকে বলুন ?

সঞ্জয় বলতে থাকে,—আমার শোবার ঘর, আর নয়নের শোবার ঘর আলাদা। সিনেমায় যাবার সময় আমি নয়নকে বলে যাই, যতক্ষণ না ফিরি, আমার ঘরটাতেই শুয়ে থাক ; ঘরটা খালি পড়ে থাকবে নইলে !···নয়ন তাই শুয়ে ছিল আমার ঘরে। খুনী হয়ত এতটা বুঝতে পারেনি। তাই আমাকে খুন করতে

গিয়ে খুন করে এসেছে নয়নকে। যদি তার নয়নকে খুন করবার ইচ্ছাই থাকতো, তাহলে সে প্রথমে নয়নের ঘরের মধ্যেই প্রবেশ করতো। নয়নের ঘরে সে প্রবেশ করেছিল, এমন কোন চিহ্ন আমি পাইনি।

চ্যাটার্জী খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকার পর বললেন, —আপনার ধারণা সত্য হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে। কারণ আমি যদি বলি, আসামী তলে তলে সমস্ত সংবাদই রেখেছিল........অর্থাৎ আপনার সিনেমায় যাওয়া এবং নয়নের কক্ষ পরিবর্তন করে শয়ন—এসব সংবাদ যদি আসামী গোপনে রেখে থাকে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই!

সঞ্জয় আর কোন কথা বলে না। কাশীপুর থানা থেকে যখন পুলিস এনকোয়ারি করতে এসেছিল, তখনও প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় তাদের একথা বলেছিল। কিন্তু চ্যাটার্জীর মতো তারাও সে কথা বিশ্বাস করেনি। হয়ত তারই অনুমান মিথ্যা। কিন্তু তবুও.......তবুও যেন তার মন শান্ত হতে চায় না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, তাকেই খুন করতে এসেছিল আততায়ী।

চ্যাটার্জী শুধোলেন,—আচ্ছা, ওই যে ডাক্তার ভদ্রলোকটিকে দেখলাম, উনি কে?

—উনি বড়দার বন্ধু।

—বড়দা অর্থাৎ?

—হরপ্রসাদবাবু।

—ও।

তেতলায় একটি নির্জন ঘরে চ্যাটার্জী আশ্রয় নিয়েছিলেন। পাশের কোন একটা ঘর থেকে ঢংঢং করে নটা বাজার আওয়াজ এল। চ্যাটার্জী গুম্ হয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর একসময় সঞ্জয়ের মুখের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,—তাহলে আপনি বলতে চান, আসামী আপনাকেই খুন করতে এসেছিল?

সঞ্জয় সংক্ষেপে বললো,—আমার বিশ্বাস তাই। সত্য কি মিথ্যা জানি না—

চ্যাটার্জী একথার কোন উত্তর না দিয়ে বললেন,—আপনাকে আরও অনেক কথা জিজ্ঞেস করবার আছে; সময়মতো সে সব কথা হবে। আপনি এখন যেতে পারেন। গিয়ে রতনকে একবার পাঠিয়ে দেবেন।

রতন এসে দাঁড়ালো ঘরের মাঝখানে। ভয়ে ওর চোখের তারা দুটো কাঁপছে! একে গোবেচারা নিরীহ মানুষ, তার ওপর গোয়েন্দাবাবু তাকে ডেকেছে শুনে অন্তরাত্মা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে!

—আমাকে ডেকেছেন গোয়েন্দাবাবু?

—হ্যাঁ, বসো।

রতন জড়সড় হয়ে বসলো খোলা জানলাটার ওপর।

চ্যাটার্জী বললেন,—দেখো, তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবো; যদি ঠিক ঠিক উত্তর না দাও, তাহলে বুঝতেই পারছো,

কোমরে দড়া বেঁধে টানতে টানতে থানায় নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাবো তোমাকে !

শুনে রতনের মুখখানা এবার সাদা হয়ে যায়। গুড়ুগুড়ু কাঁপুনি ধরে যায় হাড়ের মধ্যে। মনে মনে সে ডাকে, হে ভগবান্, হে মা কালী, হে অভয়দায়িনী..........

চ্যাটার্জী শুধোলেন,—আচ্ছা, দু-দশ দিনের মধ্যে এ-বাড়িতে রাত্রে কোন লোককে যাওয়া-আসা করতে দেখেছো ? মাঝ-রাতের কথা বলছি......যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, এমন সময়ে—দেখেছো ?

সহসা রতনের মুখে-চোখে পরিবর্তন দেখা যায়। বেশ সাগ্রহেই সে বললো,—আজ্ঞে হ্যাঁ, একদিন দেখেছি।

—দেখেছো ?

চ্যাটার্জীর মুখের ওপর দিয়ে চকিতে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ ; চোর-টোর হবে বোধ হয়।

—কেমন করে দেখলে তাকে ?

রতন বললো,—সেদিনটা খুব গরম পড়েছিল। তাই ঘরের মধ্যে না শুয়ে বাইরের বারান্দাটায় শুয়েছিলাম।

চ্যাটার্জী শুধোলেন,—নীচের তলায় না ওপরে ?

—নীচের তলায়। নীচের তলার পুবদিকের ঘরটা আমার। ঘরটার সামনেই বারান্দাটার ওপর শুয়েছিলাম।

—বেশ, তারপর ?

—হঠাৎ কেন জানি না, ঘুমটা ভেঙে গেল আমার। বোধ হয় কোন শব্দ-টব্দ হয়েছিল; ঠিক মনে পড়ছে না। ঘুম ভাঙতেই দেখি, একটা লোক সদর ফটকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বড্ড অন্ধকার ছিল জায়গাটা, তাই লোকটার মুখ-চোখ দেখতে পাইনি কিছুই। একটা ছায়ার মতো দেখেছি। লোকটাকে দেখেই বড় ভয় ধরে গিয়েছিল আমার, তাই কোন কথা বলতেও পারিনি। দেখলাম, লোকটা সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল। একটু পরেই কানে এল মোটরের শব্দ .......যেন একটা মোটর ছেড়ে গেল। লোকটা বোধ হয় মোটরে করেই এসেছিল।

ব্যাপারটা দেখেই বড়বাবুকে কথাটা বলবার জন্যে ওপরে ছুটলাম। জিরো পাওয়ারের আলো জেলে রেখে বড়বাবু রাত্রে ঘুমান। সেই আলোয় দেখলাম, তিনি জেগেই রয়েছেন। যা দেখেছিলাম, তাঁকে সব বললাম। শুনে তিনি বললেন, "চোর-টোর হবে বোধ হয়। যা তুই শুয়ে পড়গে, এ নিয়ে আর হৈচৈ করতে হবে না!" আমিও আর কোন কথা না বলে ফিরে আসি।

শুনে চ্যাটার্জী খুশী হলেন। এত সহজে রহস্যটা উন্মুক্ত হয়ে যাবে, বুঝে উঠতে পারেননি তিনি। এ পর্যন্ত তিনি বহু কেস নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, কিন্তু এত অল্পায়াসে কোন কেসের মীমাংসা হয়নি। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন,—তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করবো রতন, মিথ্যে বলো

না। তোমার বড়বাবু বা ছোটবাবুর কোন বদ নেশা আছে বলতে পারো ?

—আজ্ঞে না বাবু, ওঁদের কোনদিন কোন নেশা করতে দেখিনি !

—আচ্ছা, তোমার বড়বাবুর বন্ধু ডাক্তার শচীন দাস লোকটা কেমন ? আমার তো মনে হয় লোকটা তেমন সুবিধের নয়। তোমার কেমন মনে হয় ?

রতন আমতা-আমতা করে বললো,—আজ্ঞে আমার তো বেশ ভালই লাগে ওঁকে—আমাকে উনি খুব ভালবাসেন।

চ্যাটার্জী বললেন,—তোমাকে ভালবাসলেই যে লোক ভাল হতে হবে, এর কোন অর্থ আছে নাকি ?

—আজ্ঞে ন্-না !

রতনের এই অপ্রস্তুত ভাব দেখে চ্যাটার্জী মনে মনে হাসলেন। তারপর আবার শুধোলেন,—এ-বাড়ির মধ্যে তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন কে ?

—ছোটবাবুই বরাবর খুব ভালবাসেন। বড়বাবু তেমন বাসতেন না আগে ; কিন্তু কয়েকদিন থেকে বড়বাবুও আমাকে খুব ভালবাসছেন।

চ্যাটার্জী হেসে বললেন,—কেন বলতো ? হঠাৎ উনি তোমাকে আবার ভালবাসতে আরম্ভ করলেন কেন ?

সহসা কী যেন একটা মনে পড়ে যাওয়ায় উত্তর দিতে গিয়েও

চুপ করে গেল রতন। চ্যাটার্জী বুঝলেন ওর মনের ভাবান্তর। বললেন,—কি, চুপ করে গেলে যে?

রতন সভয়ে একবার তাকালো চ্যাটার্জীর মুখের দিকে। মুখখানা প্রায় বিবর্ণ হয়ে গেছে! যেন ভাবটা এইরকম: সে ধরা পড়ে গেছে! সত্য বলবারও উপায় নেই, আবার মিথ্যা বলতে গেলেও ফাঁসির ভয়।

চ্যাটার্জী বুঝলেন, কথায় কথায় রতন কোন একটা সাংঘাতিক জায়গায় এসে পৌঁচেছে। যেখান থেকে তার ফিরে যাবারও উপায় নেই, এগুবারও উপায় নেই। তিনি বুঝলেন, এখানে জোর দিলে একটা বিশেষ কোন রহস্য উদ্ঘাটনের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। কণ্ঠে বেশ একটু গাম্ভার্য এনে বললেন,—কা, এখনো চুপ করে রইলে, কথা বলছো না যে? এখানে তুমি আর আমি ছাড়া আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি নেই। তুমি যা বলবে, তা একমাত্র আমিই জানবো, আর কেউ জানবে না—বলো।

হঠাৎ "আঃ, মাগো" বলে আর্তনাদ করে জানলার ওপর 'থেকে মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পডলো রতন। চ্যাটার্জী বিস্ফারিত চোখে লক্ষ্য করলেন, রতনের পিঠের ঠিক মাঝখানে একটা লম্বা ধারালো ছোরা বিঁধে রয়েছে! দেখে বেশ বোঝা যায়, ছোরাটার প্রায় অর্ধেকটা ঢুকে গেছে পিঠের মধ্যে।

বারান্দার দিকের জানলাটার ওপর রতন বসে ছিল। বারান্দা দিয়েই কেউ এসে ওর পিঠে ছোরাটা বসিয়ে দিয়েছে বুঝতে

সেই রক্ত-গঙ্গার ওপর পড়ে আছে বুড়ীটা। পৃষ্ঠা—৪৩

পেরে চ্যাটার্জী ছুটে গিয়ে হাজির হলেন বারান্দায়। কিন্তু কেউ নেই! অন্ধকার বারান্দাটা নিঝুম!

চ্যাটার্জী আবার ফিরে এলেন। মেঝের ওপর দিয়ে তখন রক্তের স্রোত বইছে। আর সেই রক্তের ওপর পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে রতন—টুঁটি কাটা পাঁঠার মতো। ওর পিঠের ছোরাটা চ্যাটার্জী সাবধানে আগে টেনে বার করলেন, তারপর ঘরের কুঁজো থেকে খানিকটা জল ঢেলে নিয়ে ওর মুখে-চোখে ছিটিয়ে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন,—রতন?

কোন উত্তর আসে না রতনের কাছ থেকে। সে একাদিক্রমে ছটফট করে আর গোঙাতে থাকে। এবং চ্যাটার্জী লক্ষ্য করেন, রতনের ছটফটানি যেন ক্রমশঃই কমে আসছে—শক্তি যেন ফুরিয়ে আসছে তার। চ্যাটার্জী বুঝলেন আর অপেক্ষা করা চলে না; রতনের সময় ফুরিয়ে আসছে ক্রমশঃই। যেটুকু জানবার, এখনই জেনে নিতে হবে রতনের কাছ থেকে, নচেৎ আর কিছুই জানা যাবে না। তাই আবার ডাকলেন,—রতন!

রতন এবার অনেকটা নিস্তেজ হয়ে এসেছে। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার শেষ ক্ষণটি হুহু করে এগিয়ে আসছে। কিন্তু এবার তার কাছ থেকে সাড়া পাওয়া গেল। শুধু একটি মাত্র শব্দ—উঃ!

চ্যাটার্জী এবার ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন,—আমার কথাটার তো কোন উত্তর দিলে না রতন? বড়বাবু কেন তোমায় ভালবাসতেন আজকাল? বল, কেন? উত্তর দাও—!

বলবার চেষ্টা করলো রতন, কিন্তু পারলে না—কেবল ওর ঠোঁট দুটো কাঁপলো কয়েকবার।

চ্যাটার্জী দেখলেন বেগতিক। উত্তর পাবার আর কোন আশা নেই। তবুও শেষবারের মতো আর একবার বললেন,—রতন, উত্তরটা দিয়ে যাও!

আবার রতনের বলবার চেষ্টা দেখা গেল। কাঁপতে লাগলো ওর ঠোঁট দুটো! চ্যাটার্জী ওর মুখের কাছে কানটা নিয়ে গেলেন সাগ্রহে! হ্যাঁ, এবার কানে আসছে রতনের কণ্ঠস্বর! অতি ক্ষীণভাবে কাঁপতে কাঁপতে থামতে থামতে চ্যাটার্জীব কানে যে শব্দগুলো এল, সেগুলো পর পর সাজিয়ে নিলে এইরূপ দাঁড়ায়ঃ লোকটাকে কোনদিন চোখে দেখিনি···বাড়িটা অনেকদিনের পুরানো······৪৮ নং শৈলেন চাটুজ্জে লেন······রাত আটটার সময় তিন দিন গিয়ে চিঠি দিয়ে এসেছি······একটা বুড়ো থাকতো······

ব্যস্, এছাড়া আর কোন কথা শোনা গেল না রতনের কাছ থেকে। তার ঠোঁটটা কাঁপতে কাঁপতে থেমে গেল। চ্যাটার্জী নাড়ীটা টিপে ধরলেন। নাঃ, আর কোন স্পন্দন নেই!

## দুঃস্বপ্ন

মৃতদেহটার ভার অনাদি মিত্রের ওপর দিয়ে আর একটি নির্জন ঘরে হরপ্রসাদকে নিয়ে বসলেন চ্যাটার্জী। বললেন,— কী আশ্চর্য ব্যাপার বলুন তো! একটা লোক তিনতলায় উঠে একটা জলজ্যান্ত মানুষকে খুন করে এল, অথচ আপনারা কেউই তাকে দেখতে পেলেন না?

হরপ্রসাদ বললেন,—সত্যিই এ বড় আশ্চর্যের কথা মিস্টার চ্যাটার্জী! আমি তখন নীচেই ছিলাম। বাড়ির মধ্যে কেউ ঢুকলে বা বেরুলে নিশ্চয়ই আমার নজরে পড়তো। তাছাড়া সঞ্জয়ও তো ছিল আমার কাছে; ওর নজরেও তো কিছু পড়েনি! শুধু তাই নয়, শচীন, শশাঙ্ক, দারোগাবাবু, ইন্‌স্পেকটর-বাবু—ওঁরা তো সব দোতলার সিঁড়ির পাশের ঘরটাতেই ছিলেন। লোকটাকে চোখে না দেখুন, কিন্তু সে যখন খুন করে ছুটে নেমে আসে, তখন পায়ের শব্দটাও ওঁদের কানে যায়নি— এ-ও এক ভাববার কথা! তবে হ্যাঁ, লোকটা যদি খুন করে তেতলা থেকে জলের পাইপ বেয়ে পেছনের গলিটায় নেমে পড়ে থাকে, বা ওই পাইপ বেয়েই যদি সে উঠে থাকে, তাহলে কিন্তু ওর যাওয়া-আসার খবর আমাদের কারুর পক্ষেই জানা সম্ভব নয়!

চ্যাটার্জী শুধু মনে মনে হাসলেন। মুখে বললেন,—নামবার-উঠবার মতো জলের পাইপ আছে বুঝি ?

—আছে বইকি! আসুন, দেখাচ্ছি!

—থাক। তাহলে ওই পাইপ বেয়েই ওঠানামা করেছে বলছেন ?

—আলবত্! নইলে আমাদের এতগুলো লোককে ফাঁকি দিতে পারে ?

—একথা সত্যি।—চ্যাটার্জী বললেন,—আচ্ছা আপনার এখানে মেয়েছেলে কে কে থাকেন ?

হরপ্রসাদ বললেন,—মেয়েছেলে আছেন তিনজন। আমার স্ত্রী, বিধবা পিসীমা, আর রাঁধুনী বিরজা। বিরজা প্রায় তেরো বছর কাজ করছে এখানে। এখন ও নিজেদের লোকের মতই হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের ওপর ওর প্রভাব এত বেশী যে সময় সময় আমাদের শাসন পর্যন্ত করে! আমরাও ওকে মনে-প্রাণে ভক্তি করি।

চ্যাটার্জী খুশী হয়ে বললেন,—সত্যি, এরকম কিন্তু আজকাল দেখা যায় না! আচ্ছা, আপনার ওই যে পিসীমাটির কথা বললেন, উনি আপনার বাবার সম্পত্তির কিছু অংশ পাবেন নাকি ?

—না, সম্পত্তি ঠিক পাবেন না; তবে উইলে উল্লেখ আছে যে, যতদিন উনি বেঁচে থাকবেন, ততদিন ওঁকে এ বাড়িতে একটা ঘর দিয়ে রাখতে হবে; এবং আমাদের তিনজনের প্রত্যেককে পঞ্চাশ টাকা হিসাবে মাসোহারা দিতে হবে।

—ও! আচ্ছা, ওঁর শোবার ঘরটা কোথায়? দোতলায়, তেতলায়, না নীচে?

—দোতলায় থাকেন। একেবারে পুব-কোণের ঘরটা।

—বিরজা?

—বিরজাও দোতলায় থাকে। আমার ঘরও দোতলায়। আর শশাঙ্ক থাকে তিনতলায়।

—আপনার সন্তান কয়টি?

—একটি ছেলে—বছর তিনেকের।

একটু ইতস্তত: করে চ্যাটার্জী শুধোলেন,—স্ত্রী-ছেলে নিয়ে আপনি একটি ঘরেই থাকেন?

হরপ্রসাদ এবার অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন,—দেখুন, এসব নিতান্ত ব্যক্তিগত সাংসারিক জীবনযাত্রার কথা। এসবের সঙ্গে খুনের কী সম্বন্ধ থাকতে পারে বুঝছি না!

চ্যাটার্জী লজ্জিত কণ্ঠে বললেন,—আই রিগ্রেট্ হরপ্রসাদ-বাবু, এরকম একটা কথা জিজ্ঞেস করতে হল বলে সত্যি আমি দুঃখিত! আচ্ছা থাক, আপনাকে আর বিরক্ত করবো না। আপনি যান; দয়া করে শশাঙ্কবাবুকে একবার পাঠিয়ে দেবেন। ওঁকেও দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করবার আছে।

শশাঙ্ক এল। সুন্দর স্বাস্থ্যবান দীর্ঘ চেহারা। পরনে দামী সুট। পায়ে বার্নিশ-করা বুট। মাথার চুল ওলটানো—ব্রাশ করা। আর টানা টানা দুটো উজ্জ্বল চোখ দিয়ে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। চ্যাটার্জী মুহূর্তের

মধ্যে তাঁর তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে শশাঙ্কের আপাদমস্তকটা একবার লক্ষ্য করে নিয়ে বললেন,—আপনিই বিজয়বাবুর ছোট ছেলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনাকে সামান্য দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করবো।

—বেশ, বলুন ?

—তবে আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনাকে যে কথাগুলো জিজ্ঞেস করবো, সে কথাগুলো যেন আর কেউ জানতে না পারেন।

শশাঙ্ক বললো,—সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

—ধন্যবাদ ! আপনার শয়নকক্ষ তো তেতলায় ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনার দাদার ?

—দোতলায়। তবে পরশু দিন রাত্রে, এবং দিন পনেরোর মধ্যে আরও দুদিন দাদাকে তেতলায় শুতে দেখেছি।

—আপনার বৌদিও কি শুয়েছিলেন ?

—না, দাদা একাই শুয়েছিলেন।

চ্যাটার্জী একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন,—ওঁর একা একা এভাবে ওপরে শোবার কারণটা কি বলতে পারেন ?

—আজ্ঞে না। এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

চ্যাটার্জী বললেন,—আর একটা প্রশ্ন। দিন দশ-পনেরোর

মধ্যে কোনদিন রাত্রে আপনাদের এই বাড়িতে কোন কিছু অসংগত ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন কি? অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে, এমন কোন কিছু আপনার নজরে পড়েছে কি, যা সন্দেহজনক?

শশাঙ্ক একবার চাইলো চ্যাটার্জীর মুখের দিকে। তারপর বললো,—না, সেরকম কিছু নজরে পড়েনি। তবে পরশুদিন রাত্রে এমন একটা ব্যাপার ঘটেছিল, যেটা আজও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না!

চ্যাটার্জী সাগ্রহে শুধোলেন,—ব্যাপারটা কি?

শশাঙ্ক বলতে থাকে,—রাত তখন প্রায় বারোটা। হঠাৎ একটা চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমার দাদার গলা বলেই মনে হল। আজও মনে হচ্ছে, দাদার গলাই শুনেছি। কিন্তু তাঁর চিৎকারেব ভাষাটা ঘুমের ঘোরে খেয়াল করতে পারিনি। চিৎকারটা শুনেই আমি ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসি। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল দৌড়ানোর শব্দ। কে যেন বারান্দার ওপর দিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। আমি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতেই বুঝলাম দৌড়ানোর শব্দটা নীচে তলায় গিয়ে পৌঁচেছে। হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর এগিয়ে গেলাম দাদার ঘরখানার সামনে। গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ। ঘরের ভেতর গ্রীন্‌-বাল্‌ব্‌ জ্বলছিল। সেই আলোয় দেখতে পেলাম দাদা বেঘোরে ঘুমুচ্ছেন। দেখে বিস্ময়ের সীমা রইলো না আমার। যে দাদার চিৎকারে

আমার ঘুম ভেঙে গেল, মাত্র সেকেণ্ড কয়েকের ব্যবধানে সেই দাদাকে এমন নির্বিকারভাবে ঘুমুতে দেখছি কেমন করে? ঘণ্টা খানেকের মধ্যেও তিনি কোন সময় জেগেছিলেন বলে মনে হয় না। অথচ আমি এইমাত্র শুনলাম ওঁর চিৎকার! এ কি ব্যাপার! আমি তো অবাক! মনে মনে ভাবলাম, স্বপ্ন টপ্ন দেখিনি তো? তারপর আবার ভাবলাম, ঘুমের ঘোরে শোনা দাদার চিৎকারটাকে যদিও বা স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিই, কিন্তু দৌড়ানোর আওয়াজটা? ওটা তো জাগ্রত অবস্থাতেই আমি শুনেছি। তবে? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তো দাদাকে ডেকে তুললাম। তিনি তো হন্তদন্ত হয়ে দরজা খুলে দিয়ে বললেন, "কি রে, এত রাতে ডাকাডাকি করছিস্ কেন? কি হয়েছে?"

আমার মুখ দিয়ে সহসা কোন কথা বেরুলো না। দাদা অধৈর্য হয়ে বললেন, "কথা বলছিস্ না যে? হয়েছে কি?"

কেঁউ কেঁউ করে বললাম, "কে যেন দৌড়ে গেল বারান্দা দিয়ে —দৌড়ে নেমে গেল নীচে।" শুনে বললেন, "বারান্দা দিয়ে আবার কে দৌড়ে যাবে এত রাতে? চোর-টোর হলে চুপি চুপি যেত; দৌড়ে যাবে কেন?"

—একটু চুপচাপ রইলাম। তারপর বললাম, "একটা চিৎকারের শব্দও কানে এসেছিল—যেন তোমার গলা!" শুনে দাদা তো তেড়ে এলেন। বললেন, "কি যা-তা বলছিস্? আমি চিৎকার করেছি! নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন দেখেছিস্। যা, হাতে-মুখে ঠাণ্ডা জল দিয়ে শুয়ে পড়্ গে!"

—আমি আর কোন কথা বলতে সাহস না পেয়ে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। কিন্তু সেই থেকে আজ এখন পর্যন্ত আমি ভাবছি যে, ব্যাপারটা সত্য না দুঃস্বপ্ন? উত্তর পাচ্ছি না।

চ্যাটার্জী কথাগুলো বেশ মনোযোগ দিয়েই শুনলেন। শুনে গম্ভীর হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।
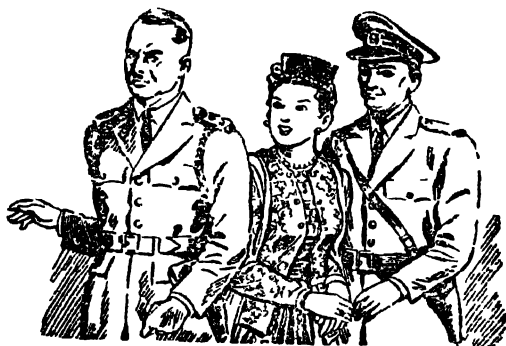
## অদৃশ্য মানুষ

শৈলেন চাটুজ্জে লেনের ৪৮নং বাড়ি। বাড়িটা একতলা। বাইরে থেকে দেখলেই বোঝা যায় বাড়ির ভেতরটা নোংরা অপরিচ্ছন্ন। অনেক দিনের পুরানো বাড়ি, এবং বহুদিন হল কোনরকম সংস্কারও করা হয়নি। বাইরে থেকে দেখলে এটুকু বোঝা যায় যে, অল্পই কয়েকটা ঘর আছে বাড়িটাতে। শৈলেন চাটুজ্জে লেনের একটা শাখা ব্লাইণ্ড লেনের মধ্যে এই বাড়িটা অবস্থিত। গলিটা খুব সরু, এবং এই সন্ধে বেলাতেই নির্জন।

সদর দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। চ্যাটার্জী কড়াটা খটা-খট করে নাড়তে লাগলেন। প্রবীর পাশে দাঁড়িয়ে।

রতনের মৃত্যুকালের কথা ক'টা চ্যাটার্জী নোট করে রেখেছিলেন নোটবুকে। সেইমতো তিনি এসে হাজির হয়েছেন এই ৪৮নং বাড়িতে।

দরজার কড়া নাড়তেই একটা বুড়ী দরজা খুলে দিল। দিয়ে পিটপিট করে জিজ্ঞাসু-নেত্রে চাইতে লাগলো চ্যাটার্জী আর প্রবীরের মুখের দিকে। চ্যাটার্জী শুধোলেন,—আর কে আছে বাড়িতে?

বুড়ী ভয়ে ভয়ে বললো,—আর তো কেউ নেই বাবা!

পাশ থেকে প্রবীর ফোড়ন কাটলো,—তিনি কোথায় গেলেন?

বুড়ী বললো,—কার কথা বলছো বাবা ?

—আহা! কিছুই যেন জানেন না! কী ভাল মানুষ!

চ্যাটার্জী ধমক দিলেন,—আঃ! তুমি একটু থাম প্রবীর! তারপর বুড়ীর দিকে চেয়ে বললেন,—তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে বুড়ী মা, চলো ভেতরে।

ভেতরে প্রবেশ করে চ্যাটার্জী সদর দরজার খিলটা এঁটে দিলেন। বুড়ী তাদের নিয়ে এসে বসালো একটা ছোট্ট ঘরে। চ্যাটার্জী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারধারটা একবার দেখে নিয়ে বললেন, —তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই বুড়ী মা।

বুড়ীর মুখ শুকিয়ে তো আমসির মতো হয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে বললো,—কি জিজ্ঞেস করতে চাও বলো।

চ্যাটার্জী শুধোলেন,—এ বাড়িতে মোট ক'টা ঘর আছে ?

—চারটে।

—তুমি ছাড়া আর কে থাকে এ বাড়িতে ? সত্যি কথা বলো ?

বুড়ী কাঁপতে শুরু করে ভয়ে। চোখ দুটো স্থির হয়ে যায় চ্যাটার্জীর চোখের ওপর…যেমন শিকারীর সামনে শিকার!

চ্যাটার্জী বললেন,—এখানে আরও একজন থাকে আমি জানি। লোকটা এখন কোথায় ? কি করে সে ? তোমার কোন ভয় নেই—তুমি সব কথা আমাদের খুলে বলো। আমরা গোয়েন্দা; থানা থেকে এসেছি। মিথ্যে কথা বললেই থানায় যেতে হবে মনে থাকে যেন!

বুড়ী বললো,—দোহাই বাবা, থানায় নিয়ে যেও না আমাকে ; যা জানি, বলছি। তারপর ফিসফিস করে বলতে লাগলো,—ওই যে লোকটার কথা বলছো, শুনেছি ও নাকি একজন গুণ্ডা! ঐ লোকটাই আমাকে মাইনে দিয়ে রেখেছে। রান্নাকরা, বাসনমাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, সবই আমি করি। কিন্তু তোমাদের সত্যি কথাই বলছি বাবা, তিনবছর ধরে কাজ করছি এখানে, লোকটাকে কোনদিন দেখিনি নিজের চোখে। একদিন মাত্র—সে প্রায় মাস ছয়েক আগে, অন্ধকারের মধ্যে আবছাভাবে দেখেছিলাম।

চ্যাটার্জী শুধোলেন,—লম্বা না বেঁটে ?

বুড়ী বললো,—লম্বা মানুষ। সেই একদিন এক নজর দেখেছিলাম ; আর কোনদিন দেখিনি। ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে বেরিয়ে যায়, সারাদিন আর বাড়ি ফেরে না—রাত বারোটায় আবার আসে। সকালে যখন বেরিয়ে যায়, তখন আমার ঘুম ভাঙে না, বারোটায় যখন ফেরে তখনও আমি ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু কথা কি জানো বাবা ? বারোটা পর্যন্ত কি আমি জেগে থাকতে পারি না, খুব পারি। কিন্তু কর্ত্তা-বাবুর হুকুম আছে, খাবার ঢেকে রেখে দিয়ে আমি যেন এগারোটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ি!

প্রবীর বললো,—বটে !

—হ্যাঁ বাবা, সত্যি কথাই বলছি। তাই কর্ত্তাকে আমার কোনদিনই দেখা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু একদিন হঠাৎ কর্ত্তা

বাড়ি ফিরলো রাত এগারোটায়। আমি তখন খাবারটা ঢেকে রেখে সবেমাত্র শুতে যাচ্ছি। বাইরেটা ঘোর অন্ধকার। দেখি একটা লোক—বেশ লম্বা মত লোকটা, দরজা ঠেলে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। তারপর দরজায় খিল এঁটে দিয়ে হন হন করে ঢুকে গেল কত্তার ঘরের মধ্যে। বুঝলাম কত্তা। অন্ধকারে কত্তাকে ঠিক ভূতের মতই দেখাচ্ছিল! ঘরে গিয়ে কত্তা আমাকেই বললো,—"যাও শুয়ে পড়ো গে। আমি বলেছিলাম না, এগারোটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়া চাই? এখনো জেগে রয়েছো যে?" শুনেই তো ভয়ে শুকিয়ে গেল আমার বুক—তখুনি ঘরে গিয়ে খিল এঁটে শুয়ে পড়লাম।

চ্যাটার্জী শুধোলেন,—কোন্‌টা কর্তার ঘর?

—ওই যে।

চ্যাটার্জী দেখলেন, দরজাটায় তালা ঝুলছে। প্রশ্ন করলেন, —চাবি তার কাছেই থাকে বোধ হয়?

—হ্যাঁ, কত্তার কাছেই চাবি থাকে। রাত্রে এসে দরজা খুলে ঘরে ঢোকেন, আবার ভোরে তালা বন্ধ করে চলে যান।

একটু থেমে চ্যাটার্জী আবার প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা বুড়ী মা, এ-বাড়িতে আর কাউকে আসতে দেখেছো কোন দিন?

বুড়ী করুণ কণ্ঠে বললো,—তোমাকে সব কথাই বলবো বাবা; কিন্তু দেখো, কত্তার কানে যেন এসব কথা না যায়! যদি কত্তা কোনরকমে জানতে পারে যে, তোমাদের আমি এসব কথা বলেছি, তাহলে আমার শাস্তি কি হবে

জানো? মৃত্যু! আমাকে এ বাড়িতে প্রথম যে কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, সে বোধ হয় কত্তারই কোন বন্ধুজন হবে! সেই লোকটাই আমাকে বলে দিয়েছিল, যদি আমি কোন কথা বাইরের কোন লোকের কাছে প্রকাশ করি……যেদিন প্রকাশ করবো, সেইদিনই হবে আমার মৃত্যু!

চ্যাটার্জী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—তোমার কোন ভয় নেই বুড়ী মা; তুমি আমি ছাড়া একথা আর কেউ জানতে পারবে না। তোমাকে আরও বলছি, দু-এক দিনের মধ্যেই লোকটাকে থানায় পুরে তুমি যাতে একটা ভাল সংসারে কাজ পাও তার ব্যবস্থা করে দেব। কিচ্ছু ভেবো না তুমি! বলো, আর কে আসে এ বাড়িতে?

বুড়ী বললো,—কোনদিনই বাবা এ-বাড়িতে কাউকে আসতে দেখিনি। কিন্তু ইদানীং একজন লোককে মাঝে মাঝে আসতে দেখছি। লোকটা এসে জানলার ফাঁক দিয়ে একটা করে চিঠি কত্তার ঘরের মধ্যে ফেলে যায়। লোকটা যে কে, তা আমি জানি না। আসে সন্ধের পর। এ পর্যন্ত পাঁচ-ছ'দিন লোকটা এসেছে।

চ্যাটার্জী বললেন,—আচ্ছা ঠিক আছে। এবার আমি কর্তার ঘরের মধ্যে একবার যেতে চাই।

বুড়ী বললো,—চাবি?

চ্যাটার্জী বললেন,—আমার কাছে বহুরকমের চাবি আছে। যে কোন একটা চাবিতে নিশ্চয়ই খুলবে। আমি একবার দেখতে চাই ঘরের মধ্যে কি কি জিনিস আছে।

—কিন্তু দেখো বাবা, কোন জিনিস যেন নাড়া-ঘাঁটা করো না, তাহলে আমার গর্দান যাবে!

—না, না, কিছু ভয় নেই তোমার।

চ্যাটার্জী তাঁর বহু চাবির একটি দিয়ে তালাটা খুলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আসবাবপত্র কিছু নেই বললেই চলে। বিছানা পাতা একটা পুরানো তক্তাপোশ, দু-একটা জামা-কাপড়, আর একটা দেওয়াল-আলমারি। আলমারিটায় একটা আয়না, কয়েকটা বই, কাঁচের গ্লাস একটা, আর একটা জলের কুঁজো।

চ্যাটার্জী শুধোলেন,—আচ্ছা বুড়ী মা, তোমার কর্তা তো দরজায় তালা দিয়ে চলে যায়, কুঁজোতে তবে জল আসে কেমন করে?

বুড়ী বললো,—কত্তা ভোরবেলা যখন বেরিয়ে যায়, তখন কুঁজোটা দরজার বাইরে রেখে যায়। আমি জল ভরে ওটা রেখে দিই দরজার গোড়ায়। একদিন পরপর কুঁজোটা বাইরে রেখে যায় কত্তা। হ্যাঁ, তোমাদের একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে বাবা; কত্তা বোধ হয় রোজ এখানে আসে না রাত্রে।

—কেমন করে বুঝলে?

বুড়ী বললো,—খাবার দেখে বুঝতে পারি। এক একদিন দেখি খাবার যেমন ঢেকে রাখি, ঠিক তেমনিই থাকে।

—ও!

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চ্যাটার্জী ঘরখানাও পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আলমারিতে যে বইগুলি ছিল, ওগুলি সবই

গল্পের বই। বইগুলি নাড়াচাড়া করতে একটা বইএর মধ্যে থেকে বেরুলো দুখানা চিঠি। চিঠি দুখানা দেখে আনন্দে ঝকঝক করে জ্বলে উঠলো চ্যাটার্জীর দুচোখ! তিনি বুড়ীর অলক্ষিতে চিঠি দুখানা পকেটস্থ করলেন। এবং ভাবতে লাগলেন, অতঃপর কি কর্তব্য ?

কর্তব্য স্থির করতে বিলম্ব হল না। ঘরের মেঝেতে এক-রকম হালকা পাউডার ছড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। পাউ-ডারটা এমনভাবে ছড়িয়ে দিলেন যেন চোখে না পড়ে। তারপর বুড়ীর সঙ্গে খানিকক্ষণ কিসব পরামর্শ করে প্রস্থান করলেন।

অদৃশ্য বিচারক—

"আঃ, মাগো" বলে আর্তনাদ করে জানলার ওপর থেকে মেঝের ওপর পড়লো রতন।

পৃষ্ঠা—১৬

## হুঁশিয়ার !

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। রাস্তার দুপাশের দোকানগুলোয় আলো জ্বলে উঠেছে। কোন কোন দোকানে চিকমিক করছে নিয়ন আলো—নানা রঙের, নানা ঢঙের।

প্রশস্ত রাজপথ। ট্যাক্সি, মোটর, ট্রাম, বাস, লরী ইত্যাদি মিলিয়ে অসম্ভব রকমের ভিড়। তবুও চ্যাটার্জী দক্ষহস্তে তাঁর মিনার্ভাখানাকে বেশ দ্রুতই ছুটিয়ে নিয়ে চলেছেন। একসময় প্রবীর প্রশ্ন করলো,—লোকটাকে আজই গ্রেফতার করতে চাও নাকি ?

চ্যাটার্জী বললেন,—ইচ্ছা আছে। কিন্তু সুযোগ ঘটবে কিনা, বুঝতে পারছি না! রাত দুটো নাগাদ একবার আসবো, দেখা যাক কি হয়? কারণ বুড়ী তো বললো, প্রতিদিন রাত্রে ও আসে না। আজ নাও আসতে পারে। আবার এ-ও হতে পারে, রাত বারোটায় এসে দুটোর আগেই চলে গেল ? আবার বারোটায় না এসে, রাত তিনটেতেও আসতে পারে! কিছুই ঠিক নেই। বুড়ীও এ-সম্বন্ধে কিছু জানে না। রাত এগারোটায় সে বিছানায় শোয়, ওঠে সকালে। এর মধ্যে কি ঘটে, না ঘটে, সে সম্বন্ধে ওর কোন ধারণাই নেই! আমিও একবার ঐ দুটোর সময় আসবো, যদি পেয়ে যাই অ্যারেস্ট করবো, নচেৎ ফিরে যাব। অপেক্ষা করবো না এক মিনিটও।

মানে আজকেই আমি ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিতে চাই না। তবে সে বারোটায় এসে দুটোর মধ্যেই চলে যাক, আর দুটোর পরই আসুক, অন্ততঃ তার পায়ের ছাপটার যাতে আমরা রেকর্ড রাখতে পারি, সেই উদ্দেশ্যেই পাউডার ছড়িয়ে রাখলাম ঘরখানার মধ্যে।

প্রবীর বললো,—লোকটা সম্বন্ধে তুমি কিছু ধারণা করতে পারছো ?

—নাঃ! কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে নিজের ব্যাপারে লোকটা যে রকম সতর্ক, তাতে বুঝতে পারা যাচ্ছে সে গভীর জলের মাছ! অনেক কিছুই রহস্য লুকিয়ে আছে লোকটার মধ্যে।

প্রবীর বললো,—আর একটা কথা জিজ্ঞেস করবো অসীমদা। তুমি যে বললে ওই লোকটাকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে তুমি উপস্থিত কোন গুরুত্ব দিতে চাও না—কেন ?

চ্যাটার্জী বললেন,—ব্যাপারটা হল এই যে, প্রথমে মূল অপরাধীকে গ্রেফতার করাই উচিত মনে কবছি। এ লোকটা তো শাখা অপরাধী। একে পরে গ্রেফতার করলেও চলবে।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো চ্যাটার্জীর গাড়িবারান্দার নীচে। ড্রইংরুমে প্রবেশ করতেই তিনি সাক্ষাৎ পেলেন অনাদি মিত্রের। মিত্রকে দেখেই তিনি সোল্লাসে বলে উঠলেন,—ওঃ! আপনি অনেকদিন বাঁচবেন মিঃ মিত্র!

মিত্র হেসে বললেন,—হঠাৎ ?

—আপনার কথাই ভাবছিলাম যে !

—বটে ! আপনিও অনেকদিন বাঁচবেন তাহলে।

চ্যাটার্জী বিস্ময়ের ভান করে বলেন,—কি রকম ?

—আমিও এতক্ষণ বসে বসে আপনার নামটাই জপ করছিলাম।

দুজনেই হেসে উঠলেন হোহো করে। প্রবীরও হাসতে লাগলো।

বাইরে জুতোর শব্দ।

তিনজনেই চাইলেন দরজার দিকে। দেখলেন সঞ্জয় প্রবেশ করছে ঘরের মধ্যে। চ্যাটার্জী সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন,—আসুন, আসুন সঞ্জয়বাবু; বসুন।

সঞ্জয় আসন গ্রহণ করলো।

—তারপর, কি খবর ?......হ্যাঁ, একটা কথা। আপনি বলছিলেন না, আততায়ী আপনাকেই খুন করতে এসে ভ্রমবশতঃ নয়নকে খুন করে গেছে ?

সঞ্জয় অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চ্যাটার্জীর মুখের দিকে চেয়ে বললো,—হ্যাঁ, আমার তাই ধারণা।

—আপনার ধারণাই ঠিক। আপনাকেই খুন করতে গিয়েছিল আততায়ী।

—কেমন করে বুঝলেন ?

সাগ্রহে প্রশ্ন করলো সঞ্জয়।

—বুঝেছি সঠিক প্রমাণ পেয়েই ; পরে আপনাকে জানাব।

—যাই হোক, এখন আমার একটা বাঁচবার উপায় ঠিক করে দিন অসীমবাবু। আমার ওপরেই যখন আততায়ীর লক্ষ্য, তখন প্রাণের আশঙ্কার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর!

—নিশ্চয়ই! ব্যবস্থা একটা করে দেব বইকি! আমি তো আর আধঘণ্টা পরে যাচ্ছিলাম আপনার কাছে ; এসে পড়েছেন ভালই হল। আপনার সঙ্গে বিশেষ একটু জরুরী আলাপ আছে—আসুন পাশের ঘরে।

প্রায় পনেরো মিনিট ধরে নিরালা কক্ষে ওঁদের দুজনের সলা-পরামর্শ চললো। তারপর আবার বেরিয়ে এলেন দুজনে। কিন্তু সঞ্জয় আর অপেক্ষা করলো না—প্রস্থান করলো গৃহাভিমুখে।

চ্যাটার্জী এবার ফিরলেন মিত্রের দিকে। বললেন,—জানলেন মিঃ মিত্র, আজ রাত্রে আমাদের অভিযানে বেরুতে হবে। আমি, আপনি, আর প্রবীর—এই তিনজনে বেরুবো।

মিত্র অবাক হয়ে বললেন,—কোথায়?

—সে এক জায়গায়।

—তার মানে?

—মানে হল এই যে, অভিযানকারীদের মধ্যে যখন আপনিও রয়েছেন, তখন যথাসময়ে সবই তো দেখতে পাবেন!

মিত্র হেসে বললেন,—এখন বলতে বাধা আছে বুঝি?

—না, বাধা অবশ্য নেই। শুনুন।

চ্যাটার্জী সব কথাই বললেন মিত্রকে। শুনে মিত্র বললেন, —ক'টার সময় আসবো আপনার এখানে ?

—আসবেন রাত ঠিক একটায়। দেড়টার সময় আমরা এখান থেকে বেরুবো।

—একজন কনস্টেবল সঙ্গে আনলে কেমন হয় ?

—না না আর কারুকে সঙ্গে আনবেন না ; তিনজনেই যথেষ্ট। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট—জানেন তো ? বেশী লোকজন নিয়ে হানা দিলে পণ্ড হয়ে যাবার আশঙ্কা !

আজ একটু সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিলেন চ্যাটার্জী আর প্রবীর। একটু ঘুমিয়ে নেবার ইচ্ছা। কারণ এখন ঘুমিয়ে না নিলে পরে আর ঘুমুবার অবসর হবে কিনা বলা শক্ত। টাইমপিসটায় রাত্রি একটার ঘরে এলার্ম দিয়ে রেখে সাড়ে ন'টার মধ্যেই ওঁরা দুজনে শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

রাত্রি ঠিক বারোটার সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো, —ক্রিং···ক্রিং····ক্রিং·········

ঘুম ভেঙে গেল চ্যাটার্জীর। রিসিভারটা তুলে নিলেন, হ্যাল্লো— ?

ফোন করছেন হরপ্রসাদ অধিকারী। তিনি ফোনে চ্যাটার্জীকে যা জানালেন তার মর্মার্থ হল এই : রাত সাড়ে আটটার সময় সঞ্জয় বেরিয়েছে বাড়ি থেকে, অথচ রাত বারোটা

বেজে গেল এখনও তার দেখা নেই। তাঁর আশঙ্কা হচ্ছে, হয়তো সঞ্জয়ের কোন বিপদ-আপদ ঘটেছে!

চ্যাটার্জী বললেন, সিনেমায় যায়নি তো?

উত্তরে হরপ্রসাদ যা বললেন, তা হল এই : সঞ্জয়ের সিনেমা দেখার ব্যাপার তিনি খুব ভাল ভাবেই জানেন। প্রথমতঃ সে সিনেমা দেখে খুব কম। বড় জোর বছরে সে চারখানা ছবি দেখে। দ্বিতীয়তঃ সে রবিবারের ম্যাটিনী শো ছাড়া অন্য কোন দিন বা অন্য কোন শো'য়ে সে সিনেমা দেখে না। কাজেই সঞ্জয় নাইট শো'তে সিনেমা দেখতে গেছে একথা তিনি মনেও স্থান দিতে ইচ্ছুক নন। তাছাড়া যদিও বা ধরা যায় সে সিনেমা দেখতেই গেছে, তাহলেও তার ফিরবার সময় হয়ে গেছে। রাত বারোটা—আবার ফিরবে কখন?

চ্যাটার্জী বললেন,—এক-একটা ছবি খুব বড় হয়, সেগুলো শেষ হতে সাধারণতঃ একটু বিলম্বই হয়।

হরপ্রসাদ বললেন,—বেশ, আরো আধঘণ্টা অপেক্ষা করে আপনাকে জানাচ্ছি।

আধঘণ্টা নয়—এক ঘণ্টা পর আবার টেলিফোনটা বেজে উঠলো। চ্যাটার্জীর টাইমপিসটায় রাত্রি একটা বাজতে তখন আর মাত্র মিনিট পাঁচেক দেরি। রিসিভারটা তিনি কানে তুলে ধরলেন। সেই একই কথা—এখনো ফেরেনি সঞ্জয়!

বাইরে মোটর থামার আওয়াজ। চ্যাটার্জী বুঝলেন মিত্রের আগমন হয়েছে।

দুটো বাজতে আর দেরি নেই। চ্যাটার্জীর কালো রঙের মিনার্ভাখানা নিঃশব্দে প্রবেশ করলো শৈলেন চাটুজ্যে লেনের মধ্যে। থমথমে রাত্রি। নিঝুম। মোটরখানা একটা অন্ধকার জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে তিনজনে চুপি চুপি এসে হাজির হলেন ৪৮নং বাড়িটার সামনে। বাড়িটার ঠিক পাশ দিয়েই একটা প্রাইভেট সংকীর্ণ গলি বেরিয়ে গেছে। প্রবীর আর মিত্রকে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে চ্যাটার্জী ওই গলিটার মধ্যে প্রবেশ করলেন। একটু এগোতেই তাঁর বাঁ পাশে একটা ঘর পড়লো। ঘরটার একটা জানলা খোলা। তিনি সেই জানলা দিয়ে ঘরের ভেতর টর্চের আলো নিক্ষেপ করে দেখলেন বুড়ীটা ঘুমুচ্ছে। কিন্তু একটা মজার ব্যাপার হল এই যে, বুড়ীর মাথার চুলের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে একটা লম্বা দড়ি; দড়িটার অপর প্রান্ত এই খোলা জানলাটার একটা গরাদের সঙ্গে আটকানো। চ্যাটার্জী দড়িটা ধরে জোরে একটা টান দিতেই বুড়ীর মাথার চুলে টান পড়লো। টান পড়তেই সে জেগে উঠলো। বুড়ীর ঘুম নাকি খুব গাঢ়। জানলার বাইরের গলি থেকে আস্তে কেউ ডাকলে সে-ডাকে ঘুম-ভাঙা বুড়ীর কোষ্ঠীতে লেখেনি। তাই এই অভিনব পন্থা!

চুল থেকে দড়ির বাঁধনটা খুলে বুড়ী এগিয়ে এলো জানলার ধারে। চ্যাটার্জী ফিসফিস করে বললেন,—এসেছে?

বুড়ী বললো,—হ্যাঁ, এসেছে; সাড়া পেয়েছি।

চ্যাটার্জী খুশী হয়ে বললেন,—উত্তম। সদর দরজাটা সন্তর্পণে খুলে দাও গে; খুলে দিয়ে আবার এসে শুয়ে পড়বে—আমরা যা করবার করবো। কর্তা তোমার ওপর তাহলে আর সন্দেহ করতে পারবে না।……যাও, আর দেরি করো না।

কথাটা বলে চ্যাটার্জী গলি থেকে বেরিয়ে আবার সদর দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়ালেন। একটু পরেই প্রায় নিঃশব্দে খিলটা খুলে গেল। প্রবীর আর মিত্রকে নিয়ে চ্যাটার্জী বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। বুড়ীকে বললেন,—যাও শুয়ে পড়ো গে তুমি।

বুড়ী চলে গেল।

ওঁরা তিনজনে এবার নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন কর্তার ঘরখানার সামনে। দরজার দু'পাশের দুটো জানলা খোলা রয়েছে। সেই জানলা দিয়ে চ্যাটার্জী ঘরের ভেতরটা লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জমাট অন্ধকারে দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরে এলো। অতঃপর তিনি পকেট থেকে পেনসিল টর্চটা বের করে মুহূর্তের জন্যে একবার আলোটা জ্বেলে দেখে নিলেন ঘরের ভেতরকার অবস্থাটা। হ্যাঁ, খাটের ওপর শুয়ে আছে একটা লোক। বেশ লম্বা গোছের লোকটা। বেশ স্বাস্থ্যবান্ পুরুষ। কিন্তু এদিকে পিছন ফিরে থাকায় দেখা গেল না ওর মুখটা। চ্যাটার্জী ফিরলেন মিত্রের দিকে। কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপিচুপি বললেন,—কি করা যায় এখন? কেমন করে অ্যারেস্ট করা যায় বলুন তো? দরজায় তো খিল আঁটা খুব সম্ভব।

দরজাটা সন্তর্পণে একবার ঠেলে দেখলেন। হ্যাঁ, খিল আঁটাই বটে! আবার মিত্রের কানে কানে চ্যাটার্জী বললেন,—ওকে কোন কিছু বুঝবার অবকাশ না দিয়েই গ্রেফতার করতে হবে। ও যদি জানতে পারে আমাদের উদ্দেশ্য, তাহলে আত্ম-হত্যাও করতে পারে, আবার···আচ্ছা একটা কাজ করলে কেমন হয়? আমরা যদি তিনজনে একসঙ্গে জোরে একটা ধাক্কা দিই দরজাটায়, তাহলে কি খিলটা ভাঙবে না? দেখে তো মনে হচ্ছে বহুদিনের পুরোনো দরজা!

মিত্র বললেন,—উত্তম যুক্তি! তিনজনে একসঙ্গে ধাক্কা দিলে নিশ্চয়ই খিল ভেঙে যাবে!

চ্যাটার্জী বললেন,—কিন্তু প্রথম ধাক্কাতেই ভাঙা চাই। নচেৎ সব ভেস্তে যাবার আশঙ্কা!

—নিশ্চয়ই ভাঙবে! নিন, আরম্ভ করুন, আর দেরি নয়।

তিনজনে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন দরজাটার সামনে। চ্যাটার্জী বললেন,—'তিন' বলার সঙ্গে সঙ্গেই ধাক্কা মারা চাই।

মিত্র আর প্রবীর দুজনেই প্রস্তুত। মিত্র বললেন,—ঠিক আছে। আর প্রবীর বললো,—আই অ্যাম রেডি অসীমদা!

উত্তেজনার আনন্দে প্রবীরের মুখ দিয়ে ইংরেজী কথা বেরিয়ে গেল।

চ্যাটার্জীও নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন ঠিকমত। তারপর বললেন,—রেডি—ওয়ান্, টু, থ্রী····

ধড়াম—

তিনজনের সমবেত ধাক্কা গিয়ে পড়লো দরজাটার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরকার খিল গেলো ছিটকে—দরজা হল উন্মুক্ত! ততক্ষণে চ্যাটার্জীর হাতের দুই সেলের টর্চটা এবং মিত্রের হাতের তিন সেলের টর্চটা জ্বলে উঠেছে! কিন্তু কী আশ্চর্য! ঘরে কেউ নেই! শূন্য কক্ষ! চ্যাটার্জীর মুখ দিয়েই প্রথম বেরিয়ে এলো,—এ কি ব্যাপার মিঃ মিত্র? কোথায় গেলো লোকটা?

মিত্রও একেবারে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন,—তাইতো! এ যে বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার!

প্রবীর বললো,—তা কি করে হয়? একটা জলজ্যান্ত লোক ঘর থেকে উবে যাবে, এটা কি একটা কাজের কথা? এই ঘরের মধ্যেই নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে!

চ্যাটার্জী বললেন,—লুকোবে কোথায়? জায়গা কই লুকোবার?

তবুও তিনি খাটের তলাটা, আলমারিটা একবার দেখে নিলেন। নাঃ, কেউ নেই! একটা আরশোলা বা টিকটিকিও নজরে পড়ে না! অতঃপর তিনি বললেন,—আপনারা এখানে একটু অপেক্ষা করুন মিঃ মিত্র, আমি একবার বুড়ীটার খোঁজ নিয়ে আসি।

এসে দেখলেন বুড়ীর ঘরের দরজাটা খোলাই রয়েছে। ভেতরে প্রবেশ করে তিনি টর্চের আলোটা জ্বাললেন। সেই আলোয় চোখের সামনে যা দেখলেন, তা অবর্ণনীয়! ভয়ে আঁতকে পিছিয়ে এলেন দু'পা! মেঝের ওপর বয়ে চলেছে রক্তের স্রোত!

বিছানাপত্র সব রক্তে ভেসে গেছে! আর সেই রক্ত-গঙ্গার ওপর পড়ে আছে বুড়ীটা। বুড়ীর পেটটা প্রায় এক হাত লম্বা করে চেরা—সমস্ত নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে পেট থেকে! দেখে চ্যাটার্জীর মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো। দুচোখে ভেসে উঠলো সরষে ফুল! কোনরকমে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। ঘরে ইলেকট্রিক আলো আছে—সুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে দিলেন। এবার তাঁর নজরে পড়লো আর একটা জিনিস। বুড়ীটার বুকের ওপর একটা ছোট্ট ভাঁজ-করা কাগজ রয়েছে। কাগজটা তুলে নিয়ে ভাঁজটা খুলে ফেললেন। তাতে খুব অল্পই কয়েকটা কথা লেখা। যা লেখা ছিল, তার হুবহু নকল এখানে দেওয়া হল :

"আমার পিছনে যে লাগে, বা আমার সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাকে এইরূপ শাস্তিই দিয়ে থাকি! তোমাদেরও আমি সাবধান করে দিচ্ছি গোয়েন্দা, হুঁশিয়ার হও!"

—আশ্চর্য !

আপনা থেকেই মিত্রের মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে এলো।

চ্যাটার্জী বললেন,—সত্যি মিত্র, এ বড় আশ্চর্যের কথাই বটে ! লোকটা যেন ভেলকি দেখিয়ে দিল ! কোথা দিয়ে যে কি হল, কিছুই বুঝতে পারছি না ! যাই হোক, এখন বুড়ীর লাশটার তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে........প্রবীর, কাজ করবে একটা ?

—বলো!

—মোটরটা নিয়ে বোঁ করে একবার থানায় গিয়ে খবরটা দিয়ে এসো।

—তথাস্তু।

প্রবীর বেরিয়ে গেল।

বাড়িটার মধ্যে যে ক'টা ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌ ছিল, সুইচ খুঁজে বার করে সব আলো ক'টাই জেলে দিয়েছেন চ্যাটার্জী আর মিত্র। লাশটার দিকে চাইতে চাইতে মিত্র বললেন,—কী বীভৎস খুন ! আর সহ্য হচ্ছে না চোখে। বাইরে গিয়ে দাঁড়াই—আসুন।

চ্যাটার্জী বললেন,—খুনীর ঘরটা একবার দেখতে হবে, চলুন। পায়ের ছাপটাও নিতে হবে।

পাউডার ছড়ানো মেঝের ওপর অনেকগুলি পায়ের ছাপের হদিশ মিললো। যথা : চ্যাটার্জীর পায়ের ছাপ, প্রবীরের ছাপ, মিত্রের, এবং খুনীর। এতগুলো ছাপের মধ্যে থেকে খুনীর ছাপটা সহজেই পাওয়া গেল। কারণ এঁদের প্রত্যেকেরই পায়ে জুতো আছে, আর খুনীর পড়েছে খালি পায়ের ছাপ। চ্যাটার্জী মিত্রকে নির্দেশ দিলেন খুনীর বাঁ ও ডান পায়ের দুটো পরিষ্কার ছাপ তুলে নেবার জন্য। নির্দেশ পেয়ে মিত্র কাজে মনোনিবেশ করলেন, আর চ্যাটার্জী ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন ঘরের আসবাব-পত্রগুলো। নাড়াচাড়া করতে লাগলেন এটা ওটা। এইভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ তিনি এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করলেন, যাতে তিনি বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হয়ে গেলেন! আলমারিটায় যে বইগুলো সাজান ছিল, সেই বইগুলির পেছন থেকে টেনে বের করলেন এক সেট ইউনিফর্ম। এই ইউনিফর্ম ব্যবহার করে পুলিসের লোকেরা। ইউনিফর্মকে সোজা বাংলায় পোশাক বলা চলে।

পরম বিস্ময়ে চ্যাটার্জী বললেন,—এ কি ব্যাপার মিঃ মিত্র! এখানে এ পোশাক কেন? এ তো পুলিসের জিনিস!

মিত্র তাকালেন। দেখে তাঁরও দুচোখ কপালে উঠবার উপক্রম! বললেন,—কোথায় পেলেন ওগুলো?

—বইগুলোর আড়ালে লুকানো ছিল। কি ব্যাপার বলুন তো? কিছু বুঝছেন?

—আজ্ঞে না, কিছুই তো বুঝতে পারছি না! এ যে ভয়ানক ব্যাপার—ঘোরতর রহস্য!

চ্যাটার্জী একটু চিন্তা করে বললেন,—আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? পুলিসকে ফাঁকি দেবার জন্য হয়তো মাঝে মাঝে এই পোশাক ও ব্যবহার করে।

মিত্র বললেন,—হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। ইউ আর রাইট্! লোকটা সেয়ানা বটে!

চ্যাটার্জী খানিকক্ষণ পোশাকটা পরীক্ষা করে আবার যথা-স্থানে রেখে দিলেন। মিত্র বললেন,—ওকি, ওগুলো আবার রেখে দিচ্ছেন কেন? সঙ্গে নিন, দরকারে লাগতে পারে।

—না থাক।

—কেন বলুন তো?

—মানে, আসামীকে আমি জানতে দিতে চাই না যে, ওর গুপ্ত ছদ্মবেশ আমরা আবিষ্কার করেছি। এতে ভবিষ্যতে আমাদের কাজের সুবিধা হবে বলেই মনে করি।

মিত্র এ-সম্বন্ধে আর কোন কথা উত্থাপন করলেন না। তিনি আবার মনঃসংযোগ করলেন পায়ের ছাপের প্রতি। চ্যাটার্জীও আবার নাড়াচাড়া করতে থাকেন এটা-ওটা।

কিছু সময়ের মধ্যেই মিত্র তাঁর ছাপ নেওয়ার কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। চ্যাটার্জী বললেন,—হল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জী, অনেক ভেবেও কিছুতেই আমি সল্‌ভ্ করতে পারছি না ঐ ব্যাপারটার।

—কোন্ ব্যাপারটার কথা বলছেন ?……ও, কেমন করে লোকটা ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল……

—হ্যাঁ।

—আমিও ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না মিঃ মিত্র ! সত্যি, ভাবতেও আশ্চর্য লাগে ! বন্ধ ঘর থেকে কেমন করে যে উধাও হয়ে গেল ! তবে যেমন করেই হোক, এ-রহস্যের সমাধান আমি করবই মিঃ মিত্র ! আজ আর হবে না—কাল সকালের দিকে আবার এখানে আসবো।

মিত্র বললেন,—শুধু অদৃশ্য হওয়াই নয়, কী আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা ! ওইটুকু সময়ের মধ্যে বুড়ীকে খুন করে একটা চিঠি পর্যন্ত লিখে রেখে গেলো, অথচ আমরা তিনটে মানুষে তার বিন্দুবিসর্গও টের পেলাম না ! বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না মিঃ চ্যাটার্জী, যে এটা কোন মানুষের কাজ !

চ্যাটার্জী তাঁর রিস্টওয়াচের দিকে তাকালেন। রাত তিনটে বেজে গেছে। আজ রাতে দু চোখের পাতা এক করবার কোন আশাই আর নেই। যদিও প্রবীরের ফেরবার প্রায় সময় হয়ে এসেছে, তবুও লাশটার ব্যবস্থা করে গৃহে ফেরা চারটার আগে নয়। চারটায় ফিরে জামা-কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুতেই পূবের আকাশ ফরসা হয়ে যাবে !

মিত্র বললেন,—আসল অপরাধীকে গ্রেফতার করছেন কবে ?

চ্যাটার্জী বললেন,—আগামী কালই গ্রেফতার করবার ইচ্ছা

ছিল ; কিন্তু এখন চিন্তা করে দেখছি, আসলকে গ্রেফতার করলে এই নকলটার আর কোন পাত্তাই পাওয়া যাবে না। আসলের সঙ্গে সঙ্গে নকলেরও প্রয়োজন ফুরোবে। দিন কয়েক অপেক্ষা করে দেখি। আসলের প্রয়োজনে নকলের পুনরাবির্ভাব ঘটলেও ঘটতে পারে।

## পুনরাবির্ভাব
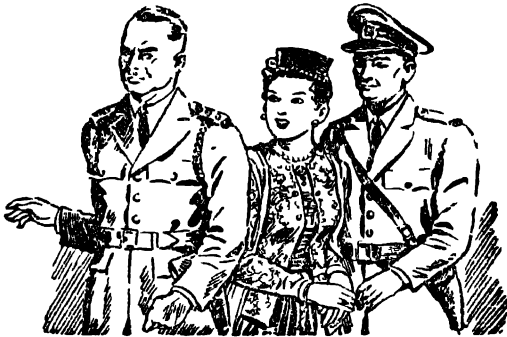
দিনের পিঠে দিন গড়িয়ে কয়েকটা দিন কেটে গেল। পৃথিবীতে বিচিত্র মানুষ। তাদের প্রত্যেকের দিনগুলো বিচিত্র-ভাবেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে কেটে গেল। ডিটেকটিভ অসীম চ্যাটার্জীর দিনগুলো যেভাবে কেটেছে, তাঁর আসামীর দিন-গুলো সেভাবে কাটেনি। তিনি যা চিন্তা করেছেন, যেভাবে চলেছেন, আসামীর চিন্তাধারা এবং গতিপথ তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। আসামীর পরিকল্পনার সঙ্গে চ্যাটার্জীর পরিকল্পনার কোন মিল নেই।

সেদিনটা ছিল একুশে মার্চ। সবেমাত্র সন্ধ্যার আঁধার নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। খোদাই-করা মণি-মাণিক্যের মতো নক্ষত্রগুলো চিকচিক করছে কালো আকাশের গায়ে। চাঁদটাও রয়েছে একপাশে—একচ্ছত্র সম্রাটের মতো।

দ্বিতলের লাইব্রেরীরুমে দেখা গেল চ্যাটার্জী ও প্রবীরকে। চ্যাটার্জী স্বদেশ ও বিদেশের বহু বই-পত্র সংগ্রহ করে রেখেছেন এই ঘরটিতে। চারটে বড় বড় আলমারি বই-এ ভরতি। অবশ্য ওর মধ্যে অধিকাংশ পুস্তকই অপরাধ-তত্ত্বমূলক। দুজনেই পুস্তক পাঠে রত। চ্যাটার্জী পড়ছেন একখানা উপন্যাস—তারাশঙ্করের "হাঁসুলি বাঁকের উপকথা", আর প্রবীর পড়ছে একখানা হাস্যরসাত্মক গল্পের বই—শিব্রাম

চকোরবরতি মহাশয়ের "জন্মদিনের উপহার"। প্রবীর অবশ্য চঞ্চল প্রকৃতির। তাই একটানা মনঃসংযোগ করে কোন বই পড়া তার ধাতে সয় না। একটা আট পৃষ্ঠার গল্প পড়ার মধ্যে সে ষোলবার বাইরে থেকে পাক মেরে আসছে। চ্যাটার্জীরও অবশ্য পড়ার দিকে তেমন মন নেই—বর্তমান রহস্য নিয়ে তিনি এক একবার উন্মনা হয়ে পড়ছেন পড়ার ফাঁকে ফাঁকে।

ঢং—

সাড়ে ছ'টা বাজলো দেওয়ালে টাঙানো ক্লকটায়। তারপরই আবার শুরু হল একঘেয়েমী শব্দ—টক্-টক্, টক্-টক্..........

ঘড়িটা কিছু বলছে নাকি? সে কি কোন উপায়ের সন্ধান দিচ্ছে 'টক্ টক্' ইঙ্গিত করে? নাঃ, কি দরকার পড়েছে তার? অপরের দিকে মাথা ঘামাবার মতো অবসরও তার নেই। সে যে দায়িত্ব মাথায় নিয়েছে, তা তাকে পালন করতেই হবে। এ-কাজে অবহেলা করবার কোন অধিকার তার নেই! কেননা এই কাজের জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

চ্যাটার্জী ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবার পড়তে শুরু করেন। মিনিট দশ-বারো হয়তো কেটেছে, এমন সময় আনন্দ ডাকলো,—বড়দা?

চ্যাটার্জী ওর দিকে চেয়ে বললেন,—কি রে?

—লম্বা মতো একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

—কে, দারোগা করুণাবাবু নাকি ?

—না। লোকটাকে আমি চিনি না। দেখিনি কোনদিন। লোকটার চোখে কালো রঙের গগল্স্, মাথায় কালো রঙের লম্বা টুপি, গায়ে ছাই রঙের কোট, পরনে ছাই রঙের স্যুট·······

চ্যাটার্জী বাধা দিয়ে বললেন,—কোথায় লোকটা ? ড্রইংরুমে ?

—না, গাড়িবারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। মোটরে এসেছেন। আমি তাঁকে ড্রইংরুমে বসতে বলেছিলাম ; কিন্তু তিনি না বসে বললেন, "ঠিক আছে, তুমি বাবুকে খবর দাও গে।"

লোকটা ড্রইংরুমে না বসায় আনন্দ রীতিমতো সংকুচিত হয়ে পড়লো। হয়তো বড়দা তাকে বকবেন। হয়তো বলবেন, "হতভাগা, এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোর ? বাড়িতে লোক এলে আদর-আপ্যায়ন করে বসাতে হয়, এটাও তোকে শিখিয়ে দিতে হবে ? নাঃ, তোকে দিয়ে আর কাজ চলবে না দেখছি !"

কিন্তু চ্যাটার্জী কিছুই বললেন না। "এসো তো প্রবীর, দেখি কোন্ মহাজন এলেন" বলে প্রবীরকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে ওঁরা দুজনে ড্রইংরুমের মধ্যে দিয়ে গাড়িবারান্দায় যাবার সময় গাড়িবারান্দার আলোটা জ্বেলে দিলেন। একখানা মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়িবারান্দার নীচে। কিন্তু লোক কই ? মোটরের মধ্যে বসে আছে নাকি ?

মোটরটার কাছে গিয়ে আঁতকে উঠলেন দুজনে! ড্রাইভারের সীটে পড়ে রয়েছেন হরপ্রসাদবাবু। দেহে প্রাণ নেই! তাঁর দুচোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে এসেছে—জিভটাও বেরিয়ে এসেছে অনেকটা! একটু লক্ষ্য করতেই বুঝলেন, কেউ গলা টিপে হত্যা করেছে তাঁকে। প্রবীর বলে উঠলো,—আশ্চর্য—অদ্ভুত!

চ্যাটার্জী শুধু বললেন,—না, আশ্চর্য নয়!

তারপর প্রবীর সহসা বলে উঠলো,—ওটা কি দেখো তো অসীমদা; ওই যে একটা কাগজ না কি পড়ে রয়েছে? আসামী চিঠি-ফিটি লিখলো নাকি আবার? আসামীদের মধ্যে এরকম একটা রেওয়াজ আছে বটে!

চ্যাটার্জী ততক্ষণে ভাঁজ-করা কাগজটা তুলে নিয়েছেন। ভাঁজটা খুলে দেখলেন, সেটা একটা চিঠিই বটে, এবং তা আসামীরই লেখা। চিঠির কথাগুলো এখানে হুবহু তুলে দেওয়া হল:

মান্যবরেষু

অসীমবাবু,

আগামী চব্বিশে মার্চ আপনার বাড়িতে গিয়ে আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। কারণ? কারণ আপনি আমার জন্য হয়রান হয়ে পড়েছেন, তাই আপনাকে একটু সুযোগ দিতে চাই। যদি আপনি আমাকে আসামী

বলে আবিষ্কার করে গ্রেফতার করতে পারেন,
আমার কোন আপত্তিই থাকবে না তাতে।
আপনি গোয়েন্দাগিরিতে কতখানি সাফল্য
অর্জন করেছেন, এইটুকুই পরীক্ষা করবার জন্যে
আমার এই অভিনব ইচ্ছা প্রকাশ।"

আশ্চর্য চিঠিখানা। চ্যাটার্জী অবাক হয়ে যান। প্রবীর কিন্তু হেসে বললো,—যত সব গুলপট্টি, বুঝলে অসীমদা ?

—হতে পারে।

এইটুকু বলে চ্যাটার্জী নীরব হলেন। কিন্তু কথাটা যেরূপ ভঙ্গী নিয়ে বা যেরূপ কণ্ঠস্বরে উচ্চারণ করলেন, তাতে হোঁচট খেলো প্রবীর। অসীমদা কি তবে বিশ্বাস করেছেন চিঠিখানা ? বিশ্বাস করবার এমন কি খুঁজে পেলেন তিনি ? কিন্তু এখন আর কোন প্রশ্ন করে না প্রবীর—সময়মতো জেনে নিলেই চলবে।

## শশাঙ্কের আতঙ্ক

হরপ্রসাদের মৃত্যুর একটা দিন পরের কথা। প্রাতরাশ শেষ করে চ্যাটার্জী মোটর নিয়ে বেরুলেন। যাবেন হরপ্রসাদ-বাবুর বাড়িতে। শশাঙ্কের সঙ্গে বিশেষ একটু প্রয়োজন আছে।

মোটরখানা ছুটে চলেছে পিচ-ঢালা সুবিস্তৃত সেণ্ট্রাল এভিনিউএর ওপর দিয়ে। তিনি ভাবতে থাকেন: মানুষের মন এক বিচিত্র জগৎ! সে-জগৎকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা কারুর নেই। একই মানুষের মনে দুই ভায়ের মতো বিরাজ করে সুন্দর ও অসুন্দর···পিশাচ ও দেবতা···মানুষ আর অমানুষ! এমন অনেক মানুষ আছে, যার চরিত্রের প্রশংসা করে প্রত্যেকে—তার কাছ থেকে একটা মিথ্যা কথারও কেউ আশা করতে পারে না····কিন্তু হঠাৎ একদিন হয়তো সকলে সবিস্ময়ে দেখলো যে, সেই লোকই একটা নির্মম খুন করে ফাঁসির মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়েছে!

ভাবতে ভাবতে চ্যাটার্জী মোটরখানা নিয়ে ৺হরপ্রসাদবাবুর বাড়িখানার সামনে এসে থামলেন। তারপর ভেতরে প্রবেশ করে সাক্ষাৎ করলেন শশাঙ্কের সঙ্গে। শশাঙ্ক তাঁকে বৈঠক-খানা ঘরে বসালো।

চ্যাটার্জী বললেন,—আপনাকে আবার খানিকটা বিরক্ত করবার জন্যে এসেছি শশাঙ্কবাবু। কয়েকটা কথা আপনাকে

জিজ্ঞেস করতে চাই। প্রশ্নগুলোর মধ্যে দু-একটা প্রশ্ন কিছু অসংগত বা শ্রুতিকটু হতে পারে। সেজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। কেননা কর্তব্যের খাতিরে সে প্রশ্নগুলো করতে আমি বাধ্য থাকবো।

—বেশ, বলুন।

শশাঙ্কের কণ্ঠস্বর একটু কেঁপে উঠলো। ভয় পেয়ে গেছে সে। সাহস যেন লোপ পেয়ে আসছে। মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। এমন কি কথা তাকে জিজ্ঞেস করবেন চ্যাটার্জী ? সে শুনেছে গোয়েন্দারা ভয়ংকর জীব! প্রশ্নের মারপ্যাঁচে তাঁরা পেটের নাড়ীভুঁড়ি পর্যন্ত টেনে বার করতে পারেন! তাঁদের কাছে নাকি একটি অক্ষরও গোপন রাখতে পারা যায় না। তাছাড়া আবার অসীম চ্যাটার্জী সাধারণ গোয়েন্দাদের পর্যায়ভুক্ত নন—একথা সে বহুলোকের মুখে শুনেছে। তিনি নাকি অসাধারণ গোয়েন্দা। তাঁর নাকি অদ্ভুত ক্ষমতা!

চ্যাটার্জী বললেন,—পরশু সন্ধ্যার দিকে তো আপনি বাড়িতে ছিলেন না ?

— আজ্ঞে না।

—গিয়েছিলেন কোথায় ?

—একটু বেরিয়েছিলাম প্রয়োজনে।

—কিন্তু আমি জানতে পেরেছি আপনি সিনেমায় গিয়েছিলেন।

—আ-আ-আজ্ঞে হ্যাঁ।

শশাঙ্ক কথাটা ইতস্ততঃ লজ্জিতকণ্ঠে বললো। দাদার রক্তে ভেজা মুহূর্তগুলিতে সিনেমার আনন্দ উপভোগ করা—সে কি কম লজ্জার কথা? এ যেন বিধাতার একটা নিষ্ঠুর পরিহাস!

চ্যাটার্জী বললেন,—আপনাকে যা জিজ্ঞেস করবো, সেই-মত সঠিক উত্তর পাব, এইটাই আমি আপনার কাছ থেকে আশা করি।

শশাঙ্কের মাথাটা হেঁট হয়ে গেল সামনের দিকে।

চ্যাটার্জী একটা সিগারেট ধরালেন। ধরিয়ে কয়েকটা টান দিলেন নিঃশব্দে। তারপর বললেন,—শুনেছি, প্রায়ই আপনি দাদার কাছ থেকে দশ টাকা, পনেরো টাকা, বিশ টাকা এইভাবে নিতেন। কিন্তু আপনার এমন কি খরচ—? শুনেছি সিনেমা-থিয়েটারে আপনার ঝোঁক আছে—প্রত্যেক মাসেই প্রায় দু' তিনবার দেখেন। তাতে বড় জোর টাকা পাঁচ-ছয় আপনার খরচ হয়। কিন্তু হরপ্রসাদবাবুর কাছ থেকে আপনি মাসে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা করে নিতেন শুনেছি। বাকী এত-গুলো টাকা আপনার খরচ হয় কিসে?

শশাঙ্কের মুখে হঠাৎ কোন কথা যোগায় না। চ্যাটার্জী কি তার পেটের নাড়ীভুঁড়ি টেনে বের করবেন?

চ্যাটার্জী বললেন,—সিনেমা-থিয়েটার ছাড়া আপনার আর কোন নেশা আছে কি? দয়া করে কোন কথা গোপন করবেন না।

শশাঙ্ক বললো,—নাঃ, আর কোন নেশা আমার নেই।

—অতগুলো টাকা কি করতেন তবে ?

শশাঙ্ক আপত্তির সুরে বললো,—দেখুন, এ-সব প্রশ্ন—

চ্যাটার্জী সলজ্জে হেসে বললেন,—অসংগত তা জানি। কিন্তু আগেই তো বলেছি, কর্তব্যের খাতিরে আপনাকে কয়েকটা অসংগত প্রশ্ন করতে বাধ্য থাকবো।

—কিন্তু এগুলো সম্পূর্ণ সাংসারিক ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—তা জানি। জেনেই প্রশ্ন করছি। এ-প্রশ্ন ভালর জন্যই। অর্থাৎ আসামীকে যাতে তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করতে পারি, তারই চেষ্টা।···আচ্ছা শশাঙ্কবাবু, সম্পত্তির লোভে ভাই ভায়ের বুকে ছুরি বসায়, এতো হামেশাই ঘটে থাকে, কি বলেন ? আপনার কি মতামত এ-সম্বন্ধে ?

—আপনি এসব কি আবোলতাবোল প্রশ্ন করছেন মিঃ চ্যাটার্জী ?

—শশাঙ্কের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। বেশ ঝাঁঝালো সুরেই সে বলে,—আপনার এ-সব প্রশ্নের কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না! আপনি যা বলতে চাইছেন পরিষ্কারভাবে বলুন।

চ্যাটার্জী পকেট থেকে একটা মানিব্যাগ বের করে বললেন, —এ ব্যাগটা বোধহয় আপনারই ?

ওঁর মুখে এক টুকরো রহস্যময় হাসি। শশাঙ্ক ঘাবড়ে

গেছে। সে অপলক দৃষ্টিতে ব্যাগটার দিকে চাইতে থাকে। তারই ব্যাগ বটে। ব্যাগটার ওপর সোনার জলে লেখা রয়েছে শশাঙ্ক—ইংরেজী হরফে। শখ করে সে ব্যাগটার ওপর নিজের নামটা লিখিয়ে নিয়েছিল। বললো,—হ্যাঁ, ব্যাগটা আমারই। কোথায় পেলেন ওটা? কয়েকদিন থেকে ব্যাগটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

এমন সময় জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি যাওযায় চ্যাটার্জী দেখলেন, মানুষেব একটা ছায়া লম্বা হযে পড়েছে জানলার গোড়ায়। ছায়াটা স্থির হয়ে পড়ে আছে। নতুন সূর্যের আলোয় ছায়াটা খুব লম্বা হয়েই পড়েছে। লোকটা কে? চ্যাটার্জী সিগারেটের শেষাংশটুকু জানলা দিয়ে ফেলবার ছল করে দেখে নিলেন, ডাক্তার শচীন দাস চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। উনি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছেন তাঁদের কথোপকথন? ভেতরে না এসে বাইরে দাঁড়িয়ে শোনার অর্থ কি? শুধু কি কৌতূহলের বশে? অন্য কোন কারণ নেই তো?

চ্যাটার্জী আবার মন দিলেন শশাঙ্কের দিকে। বললেন রহস্যকণ্ঠে,—ব্যাগটা কোথায় পেতে পারি, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই কি আপনার নেই?

আবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে শশাঙ্কের। বললো, কি এ-সব বলছেন আপনি?

—কথাগুলো বড় শ্রুতিকটু হয়ে যাচ্ছে, না? যদি বলি

এ ব্যাগটা পেয়েছি যে মোটরে আপনার দাদা নিহত হয়েছেন, সেই মোটরের পেছনের সীটে ? তাহলে কি আপনার বলবার কিছু আছে ? ব্যাগটা যে আপনার দাদা সঙ্গে করে নিয়ে যাননি, তার প্রমাণ পেয়েছি। প্রথমতঃ আপনার দাদার পকেটে তাঁর নিজস্ব ব্যাগ ছিল। দ্বিতীয়তঃ আপনার দাদা ছিলেন ড্রাইভারের সীটে, আর আপনার ব্যাগটি পাওয়া গেছে পেছনের সীটে। ব্যাগটা ও জায়গায় কেমন করে গেল, এইটুকু জানবার জন্যই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। যদি আপনার কিছু জানা থাকে, এই আশায়—।

শশাঙ্কের মুখখানা বর্ণহীন ফ্যাকাশে। অনেকক্ষণ সে কোন কথা বলতে পারে না। তারপর হঠাৎ যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল! কোথা দিয়ে কি হল, কেন যে হল, বোঝা গেল না। চিৎকার করে উঠলো শশাঙ্ক,—আপনি বেরিয়ে যান এখান থেকে! আপনার প্রলাপ শোনবার মতো সময় আমার নেই। শুধু তাই নয়, আপনার মতো শয়তান ডিটেকটিভকে আমি গ্রাহ্যও করি না!

চ্যাটার্জী বললেন,—ধীরে শশাঙ্কবাবু, ধীরে! এরই মধ্যে ধৈর্য হারালে চলবে কেন? তাছাড়া আমি তো অন্যায় কিছু বলিনি। যেরূপ ঘটেছে, আপনাকে ঠিক সেইরকমই বললাম। এতে আপনার..........

না, না, আমি কোন কথা শুনতে চাই না। আপনি যান—যান বলছি।

শশাঙ্ক ক্রোধে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। চ্যাটার্জী বললেন,—আচ্ছা আসি, পরে আবার দেখা হবে।

তিনি বেরিয়ে এলেন। কিন্তু বাইরে শচীন দাসকে আর দেখতে পেলেন না। কোথায় গেল লোকটা? কি জন্যই বা দাঁড়িয়ে ছিলেন বাইরে?

## আসামীর ইনটারভিউ

আজ চব্বিশে মার্চ। গত দিন দুটো বিচিত্র ভাবধারার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেল অসীম চ্যাটার্জীর। আজ সত্যিই কি আসামী আসবে তাঁর বাড়িতে? এ কি বিশ্বাস করবার মতো? প্রবীর বলেছে 'গুলপট্টি'! তবে কি সত্যিই তার চিঠিখানা মূল্যহীন?—একেবারে ধাপ্পা? নাঃ, একথা মানতে তাঁর মন রাজী নয়। আসামী আসবে, এটাই তাহলে সত্যি? আজ সারাদিন কোথাও বেরুনো চলবে না। দেখা যাক, কোথা-কার জল কোথায় গিয়ে পৌঁছায়?

প্রবীরও যথেষ্ট আগ্রহশীল। সে-ও ঠিক করলো, আজ কোন সময়ের জন্যও বাড়ির বার হবে না।

বেলা ন'টা অবধি চ্যাটার্জী ড্রইংরুমে খবরের কাগজটা নিয়ে কাটালেন। কি আর করবেন? অন্যদিন হলে এ সময়টা কাজে হোক, অকাজে হোক, না বেরিয়ে পারতেন না। কাজ যদি থাকে উত্তম; না থাকলে অন্ততঃ লালবাজার থানা থেকেও এক-বার ঘুরে আসা চাই!

ন'টা পর্যন্ত কাগজ পড়ে তিনি উঠে গেলেন দোতলার লাইব্রেরীরুমে। সময় কাটাবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হল বই। আলমারি থেকে একটা পছন্দমত বই টেনে নিয়ে সম্প্রতি বার্নিশ-করা ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে দিলেন তিনি।

কোথা দিয়ে যে তিন কোয়ার্টার সময় কেটে গেলো, তা তিনি ভেবেও পেলেন না। এবং এইভাবে যে আরও কতো সময় অতিবাহিত হতো, তা-ই বা কে জানে? আসামীর কথা এক-বারে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। তিন কোয়ার্টারের মাথাতেই তাঁর একাগ্রতায় বাধা পড়লো। বাধা পড়লো প্রবীরের কথায়। সে ঘরে প্রবেশ করতে করতে বললো,—আজ সময় যেন কিছুতেই কাটতে চাইছে না অসীমদা!

চ্যাটার্জী হেসে বললেন,—এরই মধ্যে এই কথা! এখন তো মোটে বেলা দশটা! রাত দশটা পর্যন্ত তো অপেক্ষা করতেই হবে। যদি বোঝ যে সময় কাটছে না, তাহলে বই নিয়ে বসে পড়ো। দেখবে কি সুন্দর সময় কেটে যায়। কারুর অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে চুপচাপ বসে থাকার সময় মিনিটগুলো ঘণ্টার মতই লম্বা মনে হয়!

প্রবীর বললো,—আচ্ছা অসীমদা, আসামী যে চিঠিতে মিথ্যে কথা লেখেনি, এর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পেয়েছো?

—না, তা পাইনি বটে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে বাজে কথা লেখেনি। সে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দেখা করবে।

প্রবীর বললো,—তোমার কি বিশ্বাস আজই সে দেখা করবে?

—হ্যাঁ। তাই মনে করি। যদিও কোন প্রমাণ পাইনি।

প্রবীর কিন্তু ভেবে পায় না অসীমদার এ বিশ্বাসের কারণ কি? খুনী আসামীর একটা সামান্য তুচ্ছ উড়ো-চিঠির ওপর

তাঁর এতখানি আস্থা কেন? অথচ প্রবীর আজ এতদিন ধরে লক্ষ্য করে আসছে তার অসীমদার কোন অনুমান কোনদিনের জন্যও ভুল হয় না। তার অসীমদা কি অন্তর্যামী, না জ্যোতিষী? জ্যোতিষীদের অনুমানও এতটা সার্থক হয় না! সে এতদিন ধরে চ্যাটার্জীর সংস্রবে রয়েছে, তবুও সে এখনো তাঁকে ভালভাবে বুঝে উঠতে পারেনি!

আনন্দের প্রবেশ।

—কি খবর হে মাস্টার?

প্রবীর সহাস্যে শুধায়।

—একজন ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

—ভদ্রলোক? চিনিস না বুঝি তাঁকে?

—আজ্ঞে না।

এবার চ্যাটার্জী জিজ্ঞেস করলেন,—ভদ্রলোকটিকে দেখতে কি রকম? বেঁটে না লম্বা?

—লম্বা। বেশ জোয়ান মতো—দোহারা গড়ন—

—লম্বা?

নিজেরই অজানিতে চ্যাটার্জীর ভ্রূ দুটো বুঝি ক্ষণিকের জন্য কেঁপে উঠলো একবার। ঐ কম্পনের মাঝে ছিল আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। সত্যি না মিথ্যা? সেই লোক, না অপর কেউ?

আনন্দ বললো,—হ্যাঁ, লম্বা গোছেরই লোকটা। পরনে সুট, গায়ে কোট, গলায় ডোরা-কাটা নেকটাই, গায়ের রঙ বেশ ফরসা, মাথার চুলগুলো কোঁকড়ানো, নাকটা উঁচু..........

চ্যাটার্জী হেসে বললেন,—লোকটাকে খুব নিখুঁতভাবেই দেখেছিস তো! কিছুই যে বাদ যায় না!

একটু লজ্জিত হয়ে আনন্দ বললো,—অচেনা লোক এলে আপনি তো নিখুঁতভাবেই সব কিছু দেখতে বলেছিলেন।

চ্যাটার্জী বললেন,—হ্যাঁ, ঠিকই তাই! এ কথাটা সর্বদার জন্যই যেন মনে থাকে! কোন অপরিচিত লোক এলেই তার চেহারা আর পোশাক-পরিচ্ছদ খুব নিখুঁতভাবে দেখে রাখবি! নিখুঁত দেখার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

প্রবীর বললো,—ঠিক এই ধরনের একটা লোক কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে অসীমদা?

চ্যাটার্জী বললেন,—ঠিক বলেছো প্রবীর, আমারও তাই বোধ হচ্ছে। চেহারাটা যেন হালেই দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। থাক, স্বচক্ষে যখন দেখা যাবে, তখন চিন্তার কি আছে—এসো।

ড্রইংরুমে পৌঁছে ওঁরা সাক্ষাৎ পেলেন ডাক্তার শচীন দাসের—৺হরপ্রসাদবাবুর বন্ধু।

—কি খবর ডাক্তারবাবু?

চ্যাটার্জীর প্রশ্নের উত্তরে শচীনবাবু বললেন,—খবর কিছু নেই অসীমবাবু; তদন্তকার্যে কতদূর এগোলেন, এইটুকুই শুধু জানতে এসেছি। যদিও হরপ্রসাদকে বা রতনকে আর কোন-দিন ফিরে পাবো না, তবুও আসামীর গ্রেফতার হওয়ার মুহূর্তটির জন্য আমি অধীরভাবে অপেক্ষা করছি। এই কারণে যে, তার

মতো পাপী যদি জগতে বেঁচে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বহুলোকের প্রাণহানি ঘটতে পারে।

চ্যাটার্জী কোন কথা না বলে চুপচাপ বসে রইলেন। মুখে শুধু একটা "হুঁ" শব্দ করলেন। হয়তো কিছু ভাববার চেষ্টা করছেন। এক্ষেত্রে আর ভাববার কি থাকতে পারে? অসীম চ্যাটার্জী এক বিচিত্র জগতের লোক.......যেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে!....

শচীন দাস চ্যাটার্জীর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

"ফোঁস"—

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালার আওয়াজ হল।

প্রবীরের মুখে ক্যাপ্সটেন সিগারেট।

দেশলাই জ্বালার শব্দে চ্যাটার্জীর ধ্যান ভাঙলো। তিনি শচীনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন,—আপনি কি যেন বলছিলেন ডাক্তারবাবু? আমাকে কি কিছু জিজ্ঞেস করছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কদ্দূর এগিয়েছেন, এইটুকুই জানতে এসেছি।

চ্যাটার্জী বললেন,—এক পা-ও এগুতে পারিনি। যেখানে ছিলাম, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি! খুব তুখড় লোক আসামী—! ক্রাইম সম্বন্ধে ওর প্রচুর জ্ঞান! তবে পূর্বেই তো আপনাকে বলেছি, ভবিষ্যতে যদি কিছু সুফল লাভ করি, আপনাকে জানাব নিশ্চয়ই।

—ধন্যবাদ।

এমন সময় বাইরে জুতোর আওয়াজ পাওয়া যায়। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে সঞ্জয়। তাকে দেখেই চ্যাটার্জী আহ্বান জানালেন,—আসুন, আসুন—নমস্কার।

—নমস্কার।—সঞ্জয়ও প্রতিনমস্কার জানায়। তারপর শচীনবাবুর দিকে চেয়ে বললো,—আপনি কখন এলেন শচীনদা ?

—এই তো আসছি ভাই।

সঞ্জয় বললো,—আমি আপনার বাড়ি গিয়েছিলাম।

—হঠাৎ ?

—এখানে একসঙ্গে আসবো বলেই আপনাকে ডাকতে গিয়েছিলাম।

—তাই নাকি ? যাক, একসঙ্গে আসা না হোক, লক্ষ্যস্থলে তো একত্রিত হওয়া গেছে! কাজেই ক্ষোভের আর কিছু নেই!

এঁদের কথায় চ্যাটার্জী মৃদু হাসলেন। তারপর সঞ্জয়কে প্রশ্ন করলেন,—তারপর সঞ্জয়বাবু, কি মনে করে ?

—নাঃ, বিশেষ কিছু নয়, এমনি!

শুষ্ক মুখে কথাটা বললো সঞ্জয়।

শচীনবাবু বললেন,—আমি কিন্তু জানি মিস্টার চ্যাটার্জী, সঞ্জয় ভাই কেন আপনার কাছে এসেছে। আমার আসার উদ্দেশ্যও ওই একই। যদিও কথাটা বলতে এতক্ষণ আমি ভরসা পাইনি!

চ্যাটার্জী বললেন,—বলুন কি বলতে চান ?

কথাটা এমনভাবে বললেন, যেন উনি ওঁদের মনের প্রশ্ন টের পেয়েছেন।

শচীনবাবু বললেন,—আমরা শুনেছি আপনি নাকি শশাঙ্কের ওপর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন······· ?

চ্যাটার্জী দৃঢ়কণ্ঠে বললেন,—হ্যাঁ। কিন্তু এ সম্বন্ধে এখন আপনাদের কোন কথাই বলতে আমি রাজী নই! যথাসময়ে সব খবর পাবেন।

পাশ থেকে সঞ্জয় বলে,—কিন্তু অসীমবাবু········

চ্যাটার্জী বাধা দিয়ে বললেন,—আপনাকে অনুরোধ করছি সঞ্জয়বাবু, এখন এ-সম্বন্ধে আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না।

সঞ্জয় চুপ করে গেলো। শচীনবাবুও কোন কথা আর জিজ্ঞেস করতে পারলেন না।

আর বইএ মন বসতে চায় না। শচীনবাবু আর সঞ্জয় চলে যাওয়ার পর থেকেই চ্যাটার্জী বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। চুপচাপ বসে কি যেন ভাবেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে প্রবীরও তাঁর কাছে যেতে আর সাহস পাচ্ছে না।

বেলা প্রায় সাড়ে তিনটে। চ্যাটার্জী শয্যায় এপাশ-ওপাশ করছিলেন। হয়ত একসময় একটু তন্দ্রার আমেজ এসেছিল। প্রবীরের কথায় সেটুকু দূর হল।

—অসীমদা ?

—উঁ ?

—শশাঙ্কবাবু এসেছিলেন।

চ্যাটার্জী শয্যার ওপর উঠে বসে বললেন,—শশাঙ্কবাবু মানে? হরপ্রসাদের ভাই?

—হ্যাঁ তিনিই। এই চিঠিখানা দিয়ে গেলেন।

চ্যাটার্জী সাগ্রহে পড়লেন চিঠিখানা। কয়েকটা কথা লেখা :

শ্রদ্ধেয় অসীমবাবু,

মনে মনে অনেক সাহস সঞ্চয় করে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। কিন্তু আপনার বাড়ির দরজায় এসে আবার সাহস হারালাম। তাই আমার বক্তব্য স্বরূপ এই ক্ষুদ্র লিপিটি প্রবীরবাবুর হাতে দিয়ে ফিরে গেলাম। আমি আপনার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছি, সেজন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে। আপনার বিচারে যদি আমি দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকি, শাস্তি নিতে প্রস্তুত আছি।

হতভাগ্য

শশাঙ্ক

চ্যাটার্জী শুধোলেন,—শশাঙ্কবাবু চলে গেছেন?

—হ্যাঁ অসীমদা; চিঠিখানা দিয়েই চলে গেছেন।

—উনি যখন এসেছিলেন, তুমি ছিলে কোথায়?

—আমি ড্রইংরুমের দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম। দেখলাম, শশাঙ্কবাবু রাস্তা থেকে ফটকের মধ্যে ঢুকেই আস্তে আস্তে

দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমাকে অবশ্য উনি দেখতে পাননি। আমি দেখলাম কি যেন উনি ভাবছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এগিয়ে গেলাম কাছে। আমাকে দেখে বেশ একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করতে বললেন,—"অসীমবাবুর সঙ্গে দেখা করাই আমার ইচ্ছা। কিন্তু—"

আমি বললাম,—"আসুন না, তিনি তো বাড়িতেই রয়েছেন।"

উনি বললেন—"না, থাক, পরে একসময় দেখা করব।"

আমি বললাম,—"বেশ লোক তো আপনি যাহোক! দেখা করবার জন্যে এতখানি পথ এলেন, এসে আবার ফিরে যাবেন?"

আমার একথা শুনে উনি খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করলেন। তারপর বললেন,—"আপনি কিছু মনে করবেন না প্রবীরবাবু, এখন অসীমবাবুর সঙ্গে দেখা করায় আমার একটু বিশেষ অসুবিধা আছে। আমার যা বক্তব্য, সেটা বরং একটা কাগজে লিখে দিয়ে যাই। দিতে পারেন একটা কাগজ?

আমি আর এ নিয়ে বিশেষ কোন হইচই না করে একটা কাগজ দিলাম। উনি এই চিঠিখানা লিখে আমার হাতে দিয়ে চলে গেলেন।

প্রবীর থামলো এই পর্যন্ত বলে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়.......

দিন গিয়ে এলো রাত। রাতও হুহু করে এগিয়ে চলে।

আটটা....ন'টা....দশটা....

সঞ্জয়, ডাক্তার, আর শশাঙ্ক ছাড়া অপর কোন প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেনি চ্যাটার্জীর বাড়িতে। চ্যাটার্জীর দুই ভ্রূর মাঝখানে একটা কুঞ্চন জেগেছে। রাত যত বাড়ে, কুঞ্চনের খাঁজ তত গভীর হয়।

সঞ্জয়....শশাঙ্ক...আর ডাক্তার শচীন দাস....

এই তিনজনের মধ্যে সে কি আছে? যদি থাকে তবে কে?

সঞ্জয়?

ডাক্তার?

শশাঙ্ক?

চ্যাটার্জী ভাবেন। এর মধ্যে যদি সে না থাকে, তবে কি তার আসার সম্ভাবনা রয়েছে এখনও? রাত দশটা বেজে গেছে। আবার সে কখন আসবে? গভীর রাতের অন্ধকারে এসে বাহাদুরি নেওয়ার কোন অর্থ হয় না। একে কি সাহস বলে? অবশ্য কাপুরুষের পক্ষে এভাবে বাহাদুরি নেওয়া সাজতে পারে! কিন্তু সে তো কাপুরুষ নয়!

টিক-টিক টিক-টিক টিক-টিক...

ঘড়িটার একঘেয়ে শব্দ বিরক্তিকর। এভাবে টিক-টিক শব্দ করে লোককে বিরক্ত করার কি অর্থ? অপদার্থ—ইডিয়ট্!

সারাদিন বাড়িতে অপেক্ষা করেও কোন কিছুর হদিস না পেয়ে চ্যাটার্জীর মনটা নিজের ওপরেই তিক্ত হয়ে উঠেছে।

কোন কিছুই ভাল লাগছে না তাঁর। সব কিছুই বিরক্তিকর মনে হচ্ছে।

ঢং—

সাড়ে দশটা।

নাঃ, আর অপেক্ষা করার মানে হয় না। সে যদি নিশুতি রাতে আসে, সেজন্য কি চ্যাটার্জীকেও রাত জেগে অপেক্ষা করতে হবে? যতো সব—! লোকটা চিঠিতে বাজে কথা লিখে তামাশা দেখছে না তো?

এমন সময় চ্যাটার্জীর ড্রইংরুমে উদয় হলেন অনাদি মিত্র, করুণা সেন ও পশুপতি ভৌমিক। অনাদি মিত্রের মতো পশুপতি ভৌমিকও লালবাজার থানার একজন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর। এঁরা দুজনেই চ্যাটার্জীর বন্ধুতুল্য। এবং এঁদের কার্যদক্ষতার ওপর চ্যাটার্জীর যথেষ্ট বিশ্বাস। তদন্তকার্যে প্রবীর ছাড়াও যদি আর কোনও লোকের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে এঁদেরই সাহায্যে কার্যোদ্ধার করেন।

দারোগাবাবুই প্রথম প্রশ্ন করলেন,—ঘাতকের খবর কি মিস্টার চ্যাটার্জী?

—কই, তার তো এখনও দেখা পেলাম না?

—কেন, আজ কি কোন লোকই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি?

—তা অবশ্য করেছে। তিনজন এসেছিলেন। শশাঙ্ক-বাবু, শচীনবাবু, আর সঞ্জয়বাবু।

পশুপতি ভৌমিক বললেন,—এঁদের মধ্যেও তো আসামী থাকতে পারে ?

চ্যাটার্জী অন্যমনস্কভাবে বললেন,—হয়তো আপনার কথাই ঠিক !

পাশ থেকে মিত্র বললেন,—কিন্তু চব্বিশে তারিখ তো কেটে যায়নি এখনও। নতুন কোন ব্যক্তির আবির্ভাব এখনও হতে পারে !

—তা-ও পারে। কাল সকালে এলেই ফাইন্যাল খবরটা জানতে পারবেন। রাত বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করব মনে করছি।

অনেক রাত হয়ে গেছে। ওঁরা আর অপেক্ষা করলেন না—প্রস্থান করলেন। চ্যাটার্জী চিন্তিতভাবে পদচারণা শুরু করেন। বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, তার বেশী নয়। মুখখানা তাঁর বিষণ্ণ। চোখে ধুলো দিয়ে যেন ভেলকি দেখাচ্ছে লোকটা। অদ্ভুত কৌশলী বটে !

রাত্রি সাড়ে বারোটায় চ্যাটার্জী শয্যায় আশ্রয় নিলেন। নাঃ, আর কেউ আসেনি।

## অপর্ণা দেবী

চ্যাটার্জী গিয়েছিলেন থানায়, বাড়ি ফিরলেন রাত্রি আটটায়। সঙ্গে মিঃ মিত্রও এসেছেন। আসামীর পায়ের ছাপ নিয়ে তাঁরা আলোচনা করছিলেন। কোন সন্দেহজনক ব্যক্তির সন্ধান পেলেই তার পায়ের ছাপটা কৌশলে নিয়ে এই ছাপটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। তবেই আসল আসামীর সন্ধান মিলবে।

ড্রইংরুমে প্রবেশ করতেই মিঃ মিত্র এবং চ্যাটার্জী সাক্ষাৎ পেলেন একটি বিধবা যুবতী মহিলার। মহিলাটির খানিকটা তফাতে একটি সোফায় গা এলিয়ে সংবাদপত্রের ওপর চোখ বুলোচ্ছে প্রবীর। অনেক পুরুষই অপরিচিত মেয়েছেলের সঙ্গে ভালভাবে কথাবার্তা বলতে পারে না। প্রবীরও সেই ধরনের। তাই খবরের কাগজ পড়বার ছল করে বসে আছে। বেলা এগারোটার মধ্যেই প্রতিদিনের সংবাদপত্র কণ্ঠস্থ করে ফেলে প্রবীর। বিকেলে বা রাত্রে কোনদিনই সে কাগজ পড়ে না। কাজেই আজকের এটা তার ছলনা ছাড়া আর কি ? একটা কিছু করতে হবে তো ? কারণ হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে হলে কথা না বলাটা অশোভন।

চ্যাটার্জী মেয়েটিকে দেখেই চিনতে পারলেন। ইনি স্বর্গতঃ

হরপ্রসাদ অধিকারীর স্ত্রী। ওঁকে দেখে চ্যাটার্জীর ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠলো। কি ব্যাপার? হঠাৎ এঁর আসার কারণটা কি? এমন কি ঘটলো?

চ্যাটার্জী প্রবেশ করতে প্রবীর বললো,—এই যে অসীমদা, এসেছো? ইনি তোমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন। এঁকে চেনো তো? ইনি শশাঙ্কবাবুর বৌদি—

—হ্যাঁ চিনি, নমস্কার অপর্ণা দেবী!

চ্যাটার্জী নমস্কার জানালেন।

অপর্ণাও প্রতিনমস্কার জানালেন। তারপর বললেন,—আমি আপনার কাছে এসেছি বিশেষ একটু দরকারে।

—আপনার আসবার কোন দরকারই ছিল না। যদি কারুকে দিয়ে খবর দিতেন, আমি নিজে গিয়েই আপনার সঙ্গে দেখা করতাম। যাক কি আপনি বলতে চান বলুন।

চ্যাটার্জী অপর্ণার সামনের আসনটিতে বসলেন। মিত্র গিয়ে বসলেন প্রবীরের পাশে।

অপর্ণা বললেন,—নিরিবিলিতে আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। আশা করি এজন্য মনে কিছু করবেন না।

—না, না, এতে মনে করবার কি আছে? আসুন পাশের ঘরে—

চ্যাটার্জী ওঁকে নিয়ে পাশের ঘরে এসে বসলেন, এবং ওঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইলেন।

অপর্ণা আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন,—আপনাকে আমি

একটি কথাই বলতে এসেছি অসীমবাবু, আপনি আমার দেওরকে চিনতে পারেননি!

চ্যাটার্জী বললেন, আপনি কি শশাঙ্কবাবুর কথা বলছেন?

—হ্যাঁ। আপনি ওকে ভুল বুঝেছেন। ওর মতো ছেলে হয় না! নিজের দাদাকে ও খুন করেছে বা করতে পারে, এটা শুধু অসম্ভব কথাই নয়, এরকম কথা যারা মনে স্থান দেয়, তাদের আমি পাগল বলেই মনে করি।

চ্যাটার্জী একথায় ক্রুদ্ধ না হয়ে মৃদু একটু হাসলেন। তারপর বললেন,—আচ্ছা শশাঙ্কবাবুর জুয়াখেলার নেশা আছে বলে আপনি কোনদিন কিছু শুনেছেন?

—ওকথা আপনি মনেও স্থান দেবেন না! জুয়া যারা খেলে, তাদের মুখে ও ঝাঁটা মারে! তাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে ও ঘৃণা বোধ করে!

—কিন্তু আমার প্রশ্ন কি জানেন অপর্ণা দেবী? আপনার স্বামীর মৃতদেহের পাশে শশাঙ্কবাবুর মানিব্যাগ যায় কেমন করে?

অপর্ণা কিছুই বুঝতে না পেরে চ্যাটার্জীর মুখের দিকে বোকার মতো চেয়ে থাকেন।

চ্যাটার্জী এবার পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলেন,—ব্যাপারটা আপনাকে সোজা কথায় বলি শুনুন। যে মোটরে আপনার স্বামীর মৃতদেহ পেয়েছি, সেই মোটরেই পেয়েছি শশাঙ্কবাবুর

মানিব্যাগটা। ব্যাগটা পড়ে ছিল পিছনের সীটে। এটা কেমন করে সম্ভব হল বলতে পারেন অপর্ণা দেবী ?

কম্পিতকণ্ঠে অপর্ণা বললেন,—কই, শশাঙ্ক তো এ কথাটা আমাকে বলেনি।

চ্যাটার্জী শুধু হাসলেন।

এরপর অনেকক্ষণ অপর্ণা চুপ করে বসে রইলেন। তারপর এক সময় হঠাৎই বলে উঠলেন,—না, না, এ হতে পারে না! ওটা নিশ্চয়ই অন্য কারোর ব্যাগ।

চ্যাটার্জী বললেন,—ব্যাগটা যে শশাঙ্কবাবুর, তা তিনি নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ রইলেন অপর্ণা দেবী। তারপর কেমন যেন অন্যমনস্ককণ্ঠে বললেন,—আচ্ছা অসীমবাবু, যে খুন করে তাকে কি কোন রকমেই বাঁচানো যায় না ?

—জানাজানি না হলে বাঁচানো যায় বটে ; কিন্তু খুনীকে যে এভাবে প্রশ্রয় দেয়, সে সমাজের শত্রু! হয়ত একথা আর কেউই টের পাবে না ; কিন্তু ভগবানের বিচারে তার ক্ষমা নেই!

অপর্ণা বললেন,—কিন্তু তাহলে আমি যে আর বাঁচব না অসীমবাবু! উনি গেছেন, তবুও শশাঙ্কের মুখ চেয়ে আমি বেঁচে আছি। ওকে আমি ছেলের মতই দেখি! ওকেও যদি আপনি কেড়ে নেন, তাহলে কাকে নিয়ে আর বাঁচবো অসীমবাবু ? আপনার পায়ে পড়ি, শশাঙ্ককে বাঁচান। আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি না, ও এমন কাজ করতে পারে! আপনি

কি ওর সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ? আপনি ভালভাবে দয়া করে খোঁজ নিন, দেখবেন শশাঙ্ক একাজ করেনি।—ও কখনো একাজ করতে পারে না।

চ্যাটার্জী সান্ত্বনার সুরে বললেন,—আপনি এরই মধ্যে এত ব্যস্ত হবেন না। শশাঙ্কবাবুর ব্যাপারে আমরা এখনও কোন সঠিক প্রমাণ পাইনি। আর দু-একদিনের মধ্যেই ওঁর সম্বন্ধে আপনাকে সঠিক খবর দিতে পারবো। কিন্তু আপনাকে অনুরোধ করছি, শশাঙ্কবাবুকে এখন এ-সম্বন্ধে কোন কথা বলবেন না।

আবার খানিকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন অপর্ণা দেবী। তারপর গাত্রোত্থান করে বললেন,—আসি অসীমবাবু, যত তাড়াতাড়ি পারেন খবরটা আমাকে জানাবেন।

—নিশ্চয়ই জানাব। দু-একদিনের মধ্যেই খবরটা পেয়ে যাবেন।

অপর্ণা দেবী প্রস্থান করেন। চ্যাটার্জীও আবার এসে বসেন ড্রইংরুমের সোফায়। মিত্র বললেন,—ব্যাপার কি ?

—নাঃ, তেমন কিছু নয়। শশাঙ্কবাবুকে আমরা সন্দেহ করেছি, এটা বুঝতে পেরে উনি জানতে এসেছিলেন ব্যাপারটা।

—আচ্ছা মিস্টার 'চ্যাটার্জী, আপনার কার ওপর বেশী সন্দেহ হয় ? শশাঙ্কবাবু, সঞ্জয়বাবু, আর শচীনবাবু—এই তিনজন তো গতকাল সাক্ষাৎ করেছেন আপনার সঙ্গে ?

—বর্তমানে তিনজনের ওপরেই আমার সমান সন্দেহ। কেন, আপনার বেশীকম সন্দেহ আছে না কি ?

মিত্র বললেন,—আমার তো শশাঙ্কবাবুর ওপরেই বেশী সন্দেহ হয়। কারণ মানিব্যাগটা ওঁর বিরুদ্ধে একটা মস্ত বড় প্রমাণ!

—কিন্তু ওটা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নয়। যে আসামী, সে যদি শশাঙ্কবাবুর ব্যাগটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে হরপ্রসাদবাবুর লাশটার পাশে ফেলে রাখে, তার কি জবাব দেবেন আপনি?

—তা বটে! সত্যি, এদিকটা চিন্তা করিনি। কিন্তু যাই হোক, আসামীর সাহসের প্রশংসা না করে পারা যায় না! দুর্দান্ত সাহস!

চ্যাটার্জী বললেন,—যারা রোমান্সের পক্ষপাতী, অর্থাৎ যারা শুধু খুন করেই তৃপ্তি পায় না, সেই খুনের মধ্য দিয়ে নানারকম কৌশল দেখিয়ে বাহাদুরি কিনতে চায়, তাদের সাহসটাই হল সবচেয়ে বড় কথা! সাহস না থাকলে রোমান্টিক হওয়া অসম্ভব! এবং দ্বিতীয়তঃ ক্রাইম সম্বন্ধে তাদের প্রচুর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমি বিশেষ অনুসন্ধান করে দেখলাম, সঞ্জয়, শশাঙ্ক, বা শচীনবাবু—এদের তিনজনেরই ক্রাইম সম্বন্ধে অতটা জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়!

—তবে?—মিত্র সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকান চ্যাটার্জীর মুখের দিকে।

চ্যাটার্জী বললেন,—এই 'তবে'র মীমাংসাই তো করতে হবে মিস্টার মিত্র! এই 'তবে'র মধ্যেই সমস্ত রহস্যটা লুকিয়ে আছে।

মিত্র বললেন,—কিন্তু গতকাল আসামী যে ছদ্মবেশে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে, এ-সম্বন্ধে আপনি তো স্থির নিশ্চিন্ত ?

—হ্যাঁ।

—তাই যদি হয়, তাহলে ঐ তিনজনের মধ্যেই যে আসামী লুকিয়ে আছে, এটাও আপনাকে বিশ্বাস করতে হয় ?

চ্যাটার্জী অন্যমনস্কভাবে বললেন,—হতে পারে !

—'হতে পারে' মানে ? সে তো আর মশা-মাছির ছদ্মবেশে আসেনি ?

চ্যাটার্জী এবার হেসে বললেন,—না, তা অবশ্য আসেনি ! …এসব কথা এখন থাক মিস্টার মিত্র, পরে আলোচনা করবো।

প্রবীর এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার সে কথা বললো,—আচ্ছা অসীমদা, আমরা যে আসামীর পায়ের ছাপ সংগ্রহ করেছি, এ খবরটা কি আসামী টের পেয়েছে বলে মনে হয় ?

—এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব বলো ? এ প্রশ্নের সঠিক কিছু ধারণা আমার নেই। তবে সে যে রকমের ভুখড় লোক, তাতে তার সমস্ত কিছু নখদর্পণে থাকাই উচিত।

এইটুকু বলে চ্যাটার্জী হঠাৎ চুপ করে গেলেন। এবং বাইরের দিকের জানলাটা দিয়ে গাড়িবারান্দার যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে, সেখানে মানুষের ছায়া দেখতে পেয়ে উঠে গেলেন। বাইরে পৌঁছে দেখতে পেলেন দারোগা করুণাবাবু সন্দিগ্ধভাবে রাস্তার দিকে চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

ব্যাপার যে একটা কিছু ঘটেছে, তা বুঝতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না চ্যাটার্জীর। বেশ খানিকটা কৌতূহল নিয়ে করুণাবাবুর পাশে গিয়ে মৃদু ও সতর্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,—ব্যাপার কি করুণাবাবু ?

করুণাবাবু বললেন,—ওই যে পানের দোকানটা রয়েছে ওই দোকানটায় আসামী এসেছিল। ঠিক সেইরকম লম্বা চেহারা, সেই পোশাক। চোখে গগল্‌স্‌, মাথায় টুপি, পরনে ছাই রঙের সুট, গায়ে ঐ রঙের কোট—আসামী ছাড়া আর কেউ নয়! দোকানটা থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে একদৃষ্টে এই দিকে তাকাচ্ছিল! এইমাত্র চলে গেল। ব্যাপার খুব সুবিধের নয় মিস্টার চ্যাটার্জী! কোন কুমতলব আছে!

চ্যাটার্জী অস্থিরকণ্ঠে বললেন,—কিন্তু অনুসরণ করলেন না কেন? কোথায় যায় দেখা উচিত ছিল! মোটর রয়েছে তো আপনার সঙ্গে?

—জানি অনুসরণ করে শত্রুর কাছে পরাজয় ছাড়া আর কোনই ফল হবে না। অর্থাৎ পদে পদে আপনার যা ঘটছে!

চ্যাটার্জী চুপ করে গেলেন। হয়ত লজ্জা পেয়েছেন। এবং করুণাবাবুর ওপর বিরক্তও হলেন যথেষ্ট। গভর্নমেণ্ট থেকে এঁরা মাসে মাসে মোটা মাইনে পান—লালবাজার থানার নাম-করা দারোগা, কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা!

আসামী কেন এসেছিল এখানে? নিশ্চয়ই কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল! কি উদ্দেশ্য? চ্যাটার্জীকে খুন করবার জন্যই

কি এসেছিল? হতে পারে। আশ্চর্য কিছু নয়! কিন্তু কী সাহস! এত লোকজনের মাঝে জাগ্রত অসীম চ্যাটার্জীকে খুন করবার অসম্ভব বাসনা নিয়ে সে তাঁর গহ্বরে হানা দিতে চায়? কথায় আছে না "পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে"? আসামীর কি সত্যিই পাখা গজিয়েছে?

চ্যাটার্জী বললেন,—বুঝছো না প্রবীর, পাখা না গজালে সে আসে আমার সঙ্গে চালাকি করতে? আশ্চর্য স্পর্ধা। চব্বিশ তারিখে আমার বাড়িতে এসে বুক ফুলিয়ে দেখা করে ভাবলে, চিরদিনই বুঝি এমনি বুক ফুলিয়ে আমার সামনে দিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াবে! অসীম চ্যাটার্জীকে সে চেনে না! বুঝলে প্রবীর, এখন ও আমাকে কেবল খুন করবার ফিকির খুঁজে বেড়াচ্ছে! আমাকে কি করে সরানো যায়, এই হয়েছে ওর এখন প্রধান চিন্তা!

গত ঘটনার তিনদিন পরের এক সকালবেলায় চ্যাটার্জীর লাইব্রেরী-রুমে এই কথোপকথন হচ্ছিল। প্রবীর বললে,— তুমি যার কথা বলছো, ঐ লোকই যে আসামী, এ সম্বন্ধে তুমি নিঃসন্দেহ?

চ্যাটার্জী বললেন,—পনেরো আনা সন্দেহই ওর ওপর। আপাদমস্তক মুখোশে ঢেকে বেশ নিশ্চিন্তে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য হবে ওর পায়ের ছাপটা নিয়ে মিলিয়ে দেখা! খুব হুঁশিয়ার হয়ে ছাপটা নিতে হবে। ঘুণাক্ষরেও যদি টের পায়, সব পণ্ড হয়ে যাবে..............তুখড় লোক!

প্রবীর আর কোন কথা না বলে একটা সিগারেট ধরিয়ে

চুপচাপ টানতে থাকে। ধোঁয়াগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে যায় ওপরের দিকে। চ্যাটার্জী হাতের কাছের রিভলভিং বুক-শেলফ্‌টা থেকে একটা বই টেনে নিয়ে পাতা উলটে নাড়াচাড়া করতে থাকেন।

দেওয়ালে টাঙানো ক্লকটায় টিকটিক শব্দ জেগেছে······ঠিক একই তালে! অনেকক্ষণ পর আবার প্রবীরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—অসীমদা?

—হুঁ?

—একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে। তুমি কাল বিকেলে যখন থানায় গিয়েছিলে, তখন শচীনবাবু এসেছিলেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

—কি বললেন তিনি?

—না, আমাকে কিছু বলেননি; তোমাকেই বলতে চান। আজ এ বেলা আসবার কথা আছে—বলে গেছেন তিনি।

এমন সময় আনন্দ এসে সংবাদ দিল, দারোগাবাবু এসেছেন। চ্যাটার্জী বললেন,—ওঁকে নিয়ে আয় এ ঘরে।····শোন্‌, আরও একজন লোকের আসবার কথা আছে। বেশ লম্বা মতো ফরসা লোক। তিনি যদি এর মধ্যে আসেন, নিয়ে আসিস এ ঘরে।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আনন্দ প্রস্থান করে।

দারোগাবাবু দরজার গোড়ায় আসতে চ্যাটার্জী সহাস্যে আহ্বান জানালেন,—আসুন ভেতরে।

দারোগাবাবু দরজার গোড়ায় জুতো জোড়াটা খুলে রেখে

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন। রসিকতার সুরে চ্যাটার্জী বললেন,—আপনি যে বড় একা! আপনার জোড়টি গেলেন কোথায়?

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ মিস্টার মিত্রের কথা বলছি।

—তাঁর তো কোন পাত্তা পেলাম না থানায়। তারপর আপনার কি খবর তাই বলুন?

চ্যাটার্জী বললেন,—খবর কিঞ্চিৎ শুভ। অর্থাৎ এতদিন অকূলে ভাসছিলাম, এখন যেন একটু কূলের নিশানা পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে!

—সত্যি?

—অবশ্য এটা আমার সন্দেহ মাত্র! আসামী চব্বিশে তারিখে আমার সঙ্গে দেখা করে ভাবলে, আমি বুঝি কিছুই টের পাব না!

করুণাবাবু বললেন,—কাকে সন্দেহ করছেন, যদি আপত্তি না থাকে....

চ্যাটার্জী লজ্জিতকণ্ঠে বললেন,—আপত্তি একটু আছে করুণাবাবু। আপত্তিটা হল এই যে, স্থির সিদ্ধান্তে না পৌঁছে কোন কিছু বলাটা আমি একেবারেই পছন্দ করি না!

করুণাবাবু এ সম্বন্ধে আর কোন কথার জের না টেনে নিজের মনেই যেন বলে উঠলেন,—কিন্তু এমন খুনীও তো কখনো দেখিনি বাবা, রীতিমতো ঘামিয়ে তুললো!

চ্যাটার্জী কঠোরস্বরে বললেন,—কিন্তু সে যত দুর্দান্ত আর

যত কৌশলীই হোক না কেন, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতেই হবে করুণাবাবু! এবং তা করতে হবে এই অসীম চ্যাটার্জীর হাতেই!

—আমিও তো এই চাই মিস্টার চ্যাটার্জী! ব্যাটার বড় বাড় বেড়েছে!

চ্যাটার্জী বললেন,—কিন্তু আপনি তো সেদিন তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিলেন করুণাবাবু!

সলজ্জে করুণাবাবু মস্তক অবনত করলেন। তারপর বললেন,—আচ্ছা আজ আসি মিস্টার চ্যাটার্জী, বসবার সময় নেই।

—এত তাড়াতাড়ি?

—আর বলেন কেন? আমাদের কথা ছেড়ে দিন। আপনারা হলেন সুখের পায়রা। খুশী মতো খান-দান ঘুরে বেড়ান; আমাদের মর্ম কি করে বুঝবেন বলুন? সরকারের চাকরি করি, খাটতে-খাটতেই জীবনটা শেষ হল!

—তা বটে!

চ্যাটার্জী মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন,—মিস্টার মিত্রের কি খবর? দিন তিনেক দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে। ফোনে অবশ্য বার দুয়েক কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু কি রকম লোক একবার দেখুন! কমিশনার সাহেব ওঁর হাতে দিলেন এই কেসটার ভার; আর উনি সেটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলেন!

দারোগাবাবু বললেন,—উনি ঐ রকমই!

চ্যাটার্জী বললেন,—আমিও অবশ্য এসব ভার নিজের কাঁধে নিয়ে খুব আনন্দ পাই। আসামী যখন ইলেক্‌ট্রিক চেয়ারে বসে প্রাণ দেয়, তখন দেখতে আমার খুব মজা লাগে!

কথা বলতে বলতে ওঁরা এসে পৌঁছালেন রাস্তার ফুটপাথে। ঠিক সেই সময় ট্রাম থেকে নামলেন ডাঃ শচীন দাস। নেমেই বললেন,—এই যে আপনারা এখানে?

চ্যাটার্জী সহাস্যে বললেন,—দারোগাবাবুকে গাড়িতে তুলে দিতে এসেছি—আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম। প্রবীরের মুখে শুনলাম, আপনি আসবেন।

একটা ডাউন ট্রাম এসে দাঁড়ালো। দারোগাবাবু 'গুড্‌ মর্নিং' জানিয়ে প্রস্থান করলেন। অতঃপর চ্যাটার্জী শচীনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ড্রইংরুমে এসে বসলেন। এবং বললেন—তারপর, কি খবর?

শচীনবাবু উলটে প্রশ্ন করলেন,—আপনার কি খবর তাই বলুন?

—মনে হচ্ছে যেন খানিকটা অগ্রসর হতে পেরেছি।

শচীনবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,—পেরেছেন? কে সে আসামী? কোথায় থাকে সে? বলুন অসীমবাবু, আমি তার টুঁটি ছিঁড়ে নেব!

চ্যাটার্জীর মুখে মৃদু হাসি!

এমন সময় প্রবীর এলো চেঁচাতে চেঁচাতে,—অসীমদা, শুভ সংবাদ! শীগগির···

কিন্তু শচীন দাসকে দেখেই হঠাৎ সে থেমে গেল!

## প্রবীরের অন্তর্ধান

—প্রবীর !

—কিছু বলছো অসীমদা ?

—ক'টা বাজলো ? ঘড়িটা দেখো তো ?

—বারোটা।

—বারোটা ? আর রাত করে লাভ নেই ; এবার রওনা হওয়া যাক, চলো।

—জামা-কাপড়টা পালটে নিই ?

—নিশ্চয়ই!·······চা খেয়ে বেরুবে নাকি ?

—মন্দ হয় না।

দুজনেই পোশাক পরিবর্তন করে নিলেন। ছাই রঙের সুট, আর সরু সরু কালো রঙের ডোরা কাটা ছিটের হাফশার্ট —যাতে অন্ধকারের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়। দুজনে একই রকমের পোশাক পরলেন। তারপর চা-পান শেষ করে মিনার্ভা-খানা নিয়ে যখন রাজপথের বুকে গিয়ে নামলেন, রাত তখন সাড়ে বারোটা।

মৌন-নিথর কোলকাতা !

জনশূন্য !

চ্যাটার্জীর গাড়িখানা শুধু হুহু করে এগিয়ে চলেছে····

সৌধকিরীটিনী মহানগরী—যে মহানগরীর সৌন্দর্যের

তুলনা নেই! কিন্তু গভীর রাতের অন্ধকারে সব সৌন্দর্যই অবলুপ্ত হয়ে গেছে! ঠিক প্রেতপুরীর মতোই দেখাচ্ছে কোলকাতা মহানগরীকে!

রাস্তার দু'ধারে লাইট-পোস্টগুলোর আলো জ্বলছে। মনে হয় ওগুলো প্রেতেরই এক-একটা জ্বলন্ত চোখ! যেন কটমট করে চাইছে!........হিংস্র জীবন্ত চোখ!

হ্যারিসন রোড অতিক্রম করে গাড়িখানা সোজা এগিয়ে চললো দক্ষিণে। বিরাট চওড়া রাস্তা এই চিত্তরঞ্জন এভিনিউ! এ রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে খুব আয়েশ। তার ওপর রাস্তা এখন জনশূন্য। চ্যাটার্জী তাই মনের সুখে পূর্ণোদ্যমে গাড়ি হাঁকিয়ে দিলেন।

আকাশে অজস্র তারা...তারাগুলোর মাঝখানে চাঁদ। চ্যাটার্জীর বড় ভাল লাগে আকাশের তারা আর চাঁদ দেখতে। কিন্তু এখন সময় নেই—ভ্রূক্ষেপও নেই!

পিঁ-ই-ই-ক পিঁ-ই-ই-ক......

চ্যাটার্জী হর্ন দিতে লাগলেন। খানিকটা তফাতে রাস্তার মাঝখানে তিনটে কুকুরে তুমুল ঝগড়া লেগেছে।

প্রবীর বলে,—আচ্ছা বেয়াড়া জীব বটে! ঝগড়া লেগেই আছে!

চ্যাটার্জী বললেন,—ঝগড়া এরা করে সত্যি; কিন্তু খানিকক্ষণ খ্যাঁক খ্যাঁক করেই এদের সব মিটে যায়! আর আমাদের—মানুষের কথাটা একবার ভেবে দেখো তো

প্রবীর! পেট চিরে নাড়ীভুঁড়ি বের করে দিয়েও আমাদের তৃপ্তি হয় না।

পিঁ-ই-ক—পিঁ-ই-ই-ই-ক—

মোটরখানা অনেকটা কাছে এসে পড়েছে। কুকুরগুলো আর রাস্তার মাঝখানে থাকতে সাহসী হয় না—ঝগড়া করতে করতেই সরে যায় একপাশে। মোটরখানাও ওদের পিছনে ফেলে তীরবেগে এগিয়ে যায়।

বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে এসে পড়লো গাড়িখানা। তারপর বাঁদিকে বেঁকে চৌরঙ্গী রোডে। চৌরঙ্গী রোড ধরে খানিকটা অগ্রসর হয়ে গাড়ি প্রবেশ করে কীড স্ট্রীটে। কীড স্ট্রীট থেকে আর একটা রাস্তায়।

রাস্তাটা গলিমতো। কোন দোকান-পসারী নেই। ঘন বসতি। বিরাট বিরাট বাড়ি।

একখানা পাঁচতলা বাড়ি। প্রাসাদের মতো। এই বাড়িটার একটু তফাতে একটা ঘন অন্ধকার জায়গা বেছে নিয়ে চ্যাটার্জীর গাড়িখানা থামলো। কালো মিনার্ভাখানা যেন হারিয়ে গেলো আঁধারের মাঝে।

চ্যাটার্জী সতর্ককণ্ঠে প্রবীরকে বললেন,—ওইযে পাঁচতলা বাড়িটা.......তুমি তো চেনো। চারতলার দক্ষিণদিকের ফ্ল্যাটে তিনি থাকেন; যাও। আমি রইলাম এখানে।

প্রবীর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে নেমে পড়ে গাড়ি থেকে। খালি পা। দ্রুত অথচ নিঃশব্দে সে এগিয়ে যায় বাড়িটার দিকে।

দূরে কোথাও একটা কুকুর আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে। হয়তো কোন শব্দে তার কাঁচা ঘুমটা ভেঙে গেছে। তাই চেঁচাচ্ছে।

আঃ! চিৎকার করবার আর সময় পেলো না কুকুরটা?

প্রবীর বিরক্ত হয়।

কিন্তু পা দুটো তার এগিয়ে চলে........

বাড়িটার ঠিক পাশ দিয়েই আর একটা সংকীর্ণ গলি বেরিয়ে গেছে। গলিটার মুখেই একটা জ্বলন্ত গ্যাস-লাইট। প্রবীর নিমেষে গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ে। যদিও বড় বড় অট্টালিকায় গলিটা ভরতি, তথাপি গলিটার অবস্থা দেখে মনে হয় না যে, এখানে কোন লোক বাস করে, বা বাস করতে পারে! লোক কেন, মনে হয় কোন কীটপতঙ্গও এখানে নেই! এমনিই নিস্তব্ধ জায়গাটা! একটা বিশ্রী আতঙ্কের নিস্তব্ধতায় জায়গাটা ঝিমিয়ে আছে।

এই সরু গলিটার মধ্যে প্রবেশ করে চ্যাটার্জীর কথামতো প্রবীর ময়লা জল নিঃসরণের একটা মোটা পাইপ আলো-আঁধারের মধ্য দিয়েই দেখতে পেলো। পাইপটা পাঁচতলা থেকে দেওয়ালের গা বেয়ে নেমে এসে মাটির তলে নেমে গেছে।

প্রবীর এতটুকু সময় নষ্ট না করে সেই পাইপের সাহায্যে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে গেল চারতলায়। পাশেই একটা জানলা। সেই জানলার গরাদে ধরে আর একটা

জানলায়। ঐ জানলার পরেই বারান্দা। কাজেই প্রবীরকে বিশেষ বেগ পেতে হল না বারান্দায় পৌঁছাতে।

সারা বাড়িখানা নিথর হয়ে আছে।—ঘুমুচ্ছে বাড়িখানা। প্রবীর সন্তর্পণে পা বাড়ায় দক্ষিণদিকের ফ্ল্যাটটার দিকে।

সহসা চাপাকণ্ঠের কথার আওয়াজ!

সতর্ক হয়ে ওঠে প্রবীর! তোমাদের মতে হয়তো তার চমকে ওঠাই উচিত ছিল। কিন্তু সে চমকে ওঠেনি এইজন্য যে, এই ধরনের কিছু একটা ঘটবে বা ঘটা সম্ভব, এইরূপ মনোভাব নিয়েই তো সে এসেছে এখানে!

আওয়াজটা আসছে পুবদিকের শেষপ্রান্তের ঘরটা থেকে। প্রবীর সতর্ক পায়ে অগ্রসর হতে থাকে ঐ দিকে। খালি পা অতিমাত্রায় নীরব!

চ্যাটার্জীর রিস্টওয়াচের কাঁটা ঘুরে চলে....

পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু কই, প্রবীর তো এখনো ফেরে না। এত দেরি হচ্ছে কেন? ব্যাপার কি? এতো দেরি হওয়ার তো কথা নয়! তারপর আবার ভাবলেন, হয়ত সে এমন কিছু লক্ষ্য করেছে, যার জন্য দেরি হওয়াটাই স্বাভাবিক! নানা কথা ভাবতে লাগলেন মনে মনে।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলে....

আরও আধঘণ্টা কেটে গেল। প্রবীরের তবু দেখা নেই।

চ্যাটার্জী এবার চিন্তিত হয়ে পড়লেন! তবে কি প্রবীরের কোন বিপদ ঘটেছে? নাঃ, আর অপেক্ষা করা চলে না···খোঁজ নিতে হবে।

গাড়ি থেকে নামলেন। তারপর সেই একই পন্থা। পাইপ বেয়ে উঠে গেলেন ওপরে। তারপর জানলা থেকে বারান্দা···বারান্দা থেকে দক্ষিণের ফ্ল্যাটে।

দক্ষিণের ফ্ল্যাটে পৌঁছাতে একফালি আলোর ছটা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। পূর্বদিকের শেষপ্রান্তের সেই ঘরটার দরজা খোলা। শুধু দরজাটাই খোলা। জানলা বন্ধ। ঐ খোলা দরজা দিয়েই একফালি আলো এসে পড়েছে বারান্দায়।

অন্যান্য ঘরগুলি নিঝ্ঝুম—ঘুমিয়ে আছে।

চ্যাটার্জী সাগ্রহে ঐ ঘরটির দিকে এগিয়ে গেলেন। কোন সাড়াশব্দ নেই। উঁকি মেরে দেখলেন ঘরটা খালি। আরও ভালভাবে উঁকি দিলেন। হ্যাঁ, খালিই বটে ঘরটা—কেউ নেই!

একটু ভেবে নিয়ে চ্যাটার্জী ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করলেন। পকেটের মধ্যে পিস্তলটা চেপে ধরেছেন এক হাতে। যে-কোন মুহূর্তে যেন ওটাকে কাজে লাগাতে পারা যায়—তাই এই প্রস্তুতি!

সারা ঘরখানা ভালভাবে পরীক্ষা করলেন, কিন্তু নির্ভরযোগ্য কিছুই মিললো না। তারপর তিনি সমস্ত ফ্ল্যাটটাই তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন—কিন্তু প্রবীর বা অন্য কোন প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেল না। তবে কি প্রবীর বিপদেই পড়েছে? ঝিমঝিম করে ওঠে তাঁর মাথাটা···

## খুনী— ?

নিঝ্‌ঝুম।

রাত একটা।

এইমাত্র কোনও গির্জার পেটাঘড়িতে ঢং করে একটা বাজলো। আওয়াজের রেশটা বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

একটা দিন কেটে গেছে। চ্যাটার্জী কিন্তু প্রবীরের কোন সন্ধানই পাননি। কে দেবে তার সন্ধান? কোথায় সে আছে, কি অবস্থায় আছে, তা ঈশ্বরই জানেন! কিন্তু সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা হল, সে বেঁচে আছে তো? আসামী! না, সে কোন মানুষ নয়—নিষ্ঠুর নিয়তি সে! তার পাষাণ প্রাণে দয়ামায়ার লেশমাত্র নেই! লম্বা ধারালো অস্ত্রটা নিয়ে মানুষের পর মানুষের মুণ্ডু কেটে গেলেও তার বিবেক সংকুচিত হয় না এতটুকু! তাইতো আশঙ্কা! হয়ত সে এতক্ষণে প্রবীরকেও......

চ্যাটার্জীর তালাবদ্ধ লৌহ-ফটকটার কিছুটা তফাতে একটা খয়েরী রঙের মোটর এসে দাঁড়ালো। অন্ধকারে ঠিক বোঝা না গেলেও খয়েরী রঙের বলেই বোধ হয়।

মোটরের দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। গাড়ি থেকে নামলো একজন লোক। না, সে তো নয়—এ অন্য জন। আমাদের আসামীর চেহারা লম্বা, কিন্তু লোকটা রীতিমতো বেঁটে। বেশ

মোটাসোটা গোলগাল চেহারা। গায়ে কালো রঙের ওভার-কোট। পরনে সুট। মাথায় ভ্রূ পর্যন্ত নামানো একটা কালো টুপি।

এ আবার কে এলো? গভীর রাতে যে এভাবে আসে, তার উদ্দেশ্য কি কখনো শুভ হতে পারে?

লোকটা এসে থামলো চ্যাটার্জীর বাড়িখানার সামনে। তফাত থেকেই বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিল, বাড়িটার কোথাও কোন আলোর নিশানা বা সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়ে কি না। নাঃ, ঘুমিয়ে আছে বাড়িখানা•••নিশ্চুপ—নিঝুম!

লোকটা পাঁচিল টপকে ভেতরে প্রবেশ করে, এবং নীরব পদক্ষেপে গাড়িবারান্দার নীচে চ্যাটার্জীর ড্রইংরুমের দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ালো। ভেতর থেকে খিল এঁটে দেওয়া দরজাটায়। কিন্তু আগন্তুক তার ওভারকোটের ভেতর থেকে এমন একটা যন্ত্র বের করলো, যার সাহায্যে সে অনায়াসেই খুলে ফেললো ওপর ও নীচেকার খিল দুটো।

মুক্ত হল পথ।

আগন্তুক প্রবেশ করলো অভ্যন্তরে।

আশ্চর্য এই রাতের আঁধার! আর নিশির এই আশ্চর্য নিশাচর প্রাণীগুলো এক-একটা অদ্ভুত রহস্যের খনি! আমাদের যে আসামী, সে এক বিশ্রী আতঙ্ক! আবার এ কে এলো? এ কি জানে না যে, এটা ডিটেকটিভ অসীম চ্যাটার্জীর বাড়ি? না জেনেই বা আসবে কেন? যার-তার বাড়িতে এভাবে প্রবেশ

করার কোন কারণ থাকতে পারে না। যদি চুরি করবার ইচ্ছাও থাকে, তাহলে যে বাড়িতে চুরি করবে সে বাড়ির মোটামুটি পরিচয় না জেনেই বা সে আসবে কেন? কাজেই সব জেনে-শুনেই বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে লোকটা এসেছে বোঝা যায়।

লোকটা তাহলে জেনে শুনেই চ্যাটার্জীর মতো গোয়েন্দার বাড়িতে প্রবেশ করেছে? আশ্চর্য সাহস! নাঃ, সাহস নয়। জেনে-শুনে সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করাকে সাহস বলে না—বলে পাগলামি!

ওপরে উঠবার যে সিঁড়ি, আগন্তুক টর্চ জেলে সিঁড়িটা আবিষ্কার করলো। বেশ প্রশস্ত সিঁড়ি। নীরব পায়ে লোকটা উঠে এলো ওপরে। উঠে বারান্দা ধরে একটু এগোতেই একটা আবছা আলোকিত কক্ষ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। চ্যাটার্জী তাহলে এখনো জেগে আছেন? বড় ভাবনায় পড়লো লোকটা! চ্যাটার্জীর বাড়িতে সে এর আগে আর কোন দিনও আসেনি। কিন্তু সে যা শুনেছে, তাতে সে মনে মনে হিসাব করে বুঝলো ওটা চ্যাটার্জীর ল্যাবরেটরি-রুম। ল্যাবরেটরি-রুমে যখন আলো জ্বলছে, তখন তিনি নিশ্চয়ই জেগে আছেন। এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটা ভাবতে লাগলো কি করা যায় এখন? জাগ্রত সিংহের সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া কি উচিত হবে? তবে কি ফিরেই যাবে? নাঃ, ফিরে যাবে না! ফিরে গেলে কড়কড়ে নোটগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে! কাজটা হাঁসিল করে যেতে পারলে অনেকগুলো টাকা সে বকশিশ পাবে!

কাজটা শেষ করা অবশ্য এমন কিছুই কঠিন ব্যাপার নয়! চ্যাটার্জী জাগ্রত রয়েছেন, এইজন্যই যা একটু আশঙ্কা! তার কাছে এমন এক পিস্তল আছে, যে পিস্তল থেকে গুলি ছুটে যায় নিঃশব্দে ; এবং সে গুলি দেহের যে-কোন অংশেই বিঁধুক না কেন, বিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু অনিবার্য! কারুর ক্ষমতা থাকবে না তাকে বাঁচাবার—স্বয়ং ঈশ্বরেরও না! কারণ সে গুলির সঙ্গে দেওয়া আছে এক প্রকার অতি উগ্র বিষ!

পিস্তলটা হাতের মুঠোয় ভাল করে চেপে ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে ওই ঘরটার দিকে। জানলার কাছে এসে সন্তর্পণে উঁকি দেয়। জানলাটার দিকে পেছন দিয়ে একটা চেয়ারে বসে চ্যাটার্জী কি যেন পরীক্ষা করছেন টেবিলের ওপর। শুধু টেবিলটার ওপর একটা টেবিল-ল্যাম্প—আর কোন আলো নেই ঘরে। এই তো সুবর্ণ সুযোগ! এর চেয়ে সুন্দর সুযোগ আর কী হতে পারে? লোকটা চ্যাটার্জীর পিঠ লক্ষ্য করে পিস্তল তুলে ধরলো। চ্যাটার্জীর আয়ু কি শেষ হয়ে এলো? পিছনে সাক্ষাৎ নিয়তি—অথচ তাঁর কিছুমাত্র হুঁশ নেই!

লোকটা আর অপেক্ষা করে না। এমন সুযোগ হারালে আর আসবে না! পিস্তলের ঘোড়াটা সে টিপে দেয়··· নিঃশব্দে এক ঝলক আগুন ছড়িয়ে গুলিটা ছুটে গিয়ে বেঁধে চ্যাটার্জীর পিঠে!···

একটা আর্তনাদ···

পিস্তলের ঘোড়াটা সে টিপে দেয় নিঃশব্দে এক ঝলক আগুন ছড়িয়ে
গুলিটা ছুটে গিয়ে বেধে চ্যাটার্জীর পিঠে। পৃষ্ঠা—৯৬

লোকটা এদিকে পগার পার! ছুটতে ছুটতে নিজের মোটরে এসে আরোহণ করেই স্টার্ট দিল।

হাওয়ার গতিতে ছুটে চলে গাড়িখানা! শত্রুর নিপাত করে বিজয়ীর মতই যেন ছুটে চলেছে...

গাড়িখানা খানিকটা এগিয়ে যেতেই চ্যাটার্জীর বাড়ির সামনেই যে চারতলা সুবিরাট অট্টালিকা, সেই অট্টালিকার অভ্যন্তর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো কালো রঙের আর একখানা মোটর। এবং সমস্ত আলো নিভিয়ে রেখে শিকারী বিড়ালের মতো নিঃশব্দে সেটা অনুসরণ করলো অগ্রগামী গাড়িখানাকে....

বহুদিনের পুরানো বিরাট দোতলা বাড়ি। বাড়িটার অনেক স্থানেই ফাট ধরেছে। এবং সেই সব ফাটা অংশ থেকে বট, অশ্বত্থ, ডুমুর প্রভৃতি গাছও গজিয়ে উঠেছে।

দমদম বিমান-ঘাঁটির নিকটস্থ কৈখালী নামে যে জায়গা, সেই জায়গারই কোনও এক নিভৃত নির্জন অংশে চওড়া কাঁচা রাস্তার ওপর এই বাড়িখানা অবস্থিত। বাড়িটার আশপাশের অনেকখানি জায়গার মধ্যে আর কোন বাড়ি-ঘর নেই। রাস্তার দুধারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে শুধুই বন। তেঁতুল, নিম, অশ্বত্থ, সোঁদাল, আম, এবং নানারকম বন্য লতা-গুল্মে চারিধার ঢাকা। এই বনের মধ্যেই নিজের দেহটাকে অনেকখানি লুকিয়ে রেখে বাড়িখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

খয়েরী রঙের মোটরখানা এই বাড়িটারই সামনে এসে দাঁড়ালো।

রাত প্রায় দুটো।

ওভারকোট পরা বেঁটে লোকটা গাড়ি থেকে নেমে বন-ঝোপ সরিয়ে বাড়িখানার মধ্যে ঢুকে গেল। তার মুখখানা খুশিতে ভরা। চ্যাটার্জীকে যমালয়ে পাঠাতে পেরেছে, ওস্তাদের কাছ থেকে তাই সে আজ মোটা বকশিশ পাবে!

নীচেকার ঘরগুলো সবই ভাঙাচোরা। দেওয়ালের অধিকাংশ জায়গা থেকেই চুন-বালি খসে গিয়ে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। দরজা-জানলার কপাটগুলো'ও নেই—উইপোকায় শেষ করে দিয়েছে।

গভীর রাতের পোড়োবাড়ি। ভৌতিক বিভীষিকায় থমথম করছে সারা বাড়িটা। অজস্র বন্য পোকা-মাকড়ের চিৎকারে একটা অদ্ভুত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে!

ফাটল-ধরা ভাঙা জীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে লোকটা উঠে এলো ওপরে। ওপরের উত্তর প্রান্তের ঘরটা স্বল্পালোকে আলোকিত। লোকটা কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে সোজা ঐ ঘরখানার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলো।

ঘরটার একপাশে আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে যে লোকটা অর্ধশায়িত অবস্থায় ধূমপান করছে, সে হল আমাদের আসামী। দরজার গোড়ায় পায়ের শব্দ পেয়ে সে ফিরে তাকালো। এবং সাগ্রহে আগন্তুককে প্রশ্ন করলো,—এই যে এসেছো! তারপর, কি খবর? শেষ করতে পেরেছো শয়তানকে?

লোকটা একটু এগিয়ে গিয়ে বললো,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সত্যি বলছো ?

আনন্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় আসামী।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলছি। কাল সকালে খোঁজ নিয়ে দেখবেন !

—যাক, স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো এতক্ষণে ! গুলিটা ঠিক বিঁধেছে তো তার গায়ে ?

—নিশ্চয়ই ! গুলিটা বিঁধতেই যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠেছে—আমি নিজের কানে শুনেছি !

—উত্তম !......তারপর তোমার টাকাটা এখনিই দিয়ে দেব নাকি ?

মাথা চুলকাতে চুলকাতে লোকটা বলে,—আজ্ঞে দিয়ে দিলে আপনারই একটা কাজ মিটে থাকে !

—বেশ নিয়ে নাও।

পকেট থেকে এক গোছা নোট বের করে আসামী বেঁটে লোকটার দিকে এগিয়ে দিল। লোকটা খুশীমনে টাকাগুলো পকেটস্থ করে বললো,—এবার তাহলে ঐ প্রবীর ছোকরাটাকেও যমালয়ে পাঠিয়ে দিই ; ওটাকেই বা আর রেখে লাভ কি ? বলেন তো আমিই ওকে শেষ করে দিয়ে আসি।

আসামী সিগারেটে শেষ সুখটান দিয়ে বললো,—নাঃ, ওটাকে আমি নিজের হাতেই শেষ করতে চাই !

—তাহলে আর দেরি করবেন না, যত তাড়াতাড়ি আপদ দূর করা যায়, ততই নিরাপদ !

—ঠিক বলেছো। না আর দেরি করবো না ; চল, এখুনিই গিয়ে শেষ করে দিয়ে আসি !

আসামী উঠে দাঁড়ালো। সুদীর্ঘ লম্বা চেহারা। তারপর সে পোশাকের আড়াল থেকে টেনে বার করলো একহাত দীর্ঘ একটা চকচকে ছোরা ! লণ্ঠনের মৃদু আলোতেও সেটা অস্বাভাবিক রকমের ঝলমলিয়ে উঠলো ! প্রবীরের আসন্ন মৃত্যুর আভাস ঐ ঝলমলানোর মধ্যেই পাওয়া গেল।

অস্ত্রটার তীক্ষ্ণতা একবার পরীক্ষা করে নিয়ে আসামী বললো, —ঠিক আছে, চলো। এক কোপে মুণ্ডুটা উড়িয়ে দেবার মতো ধার এখনও যথেষ্ট আছে !

কথাটা বলে নিঃশব্দে একবার সে হেসে নিল। অতি ভয়ংকর সে হাসি। সে হাসি কোন মানুষের নয় যেন ! অপার্থিব হাসি !

ঠিক এমনি সময়—

হঠাৎ—অতি অপ্রত্যাশিতভাবে আসামী ও তার বেঁটে অনুচরটিকে হতভম্ব করে দিয়ে সেই কক্ষে উদয় হলেন অসীম চ্যাটার্জী স্বয়ং ! তাঁর হাতে উদ্যত রিভলভার !—যে কোন মুহূর্তে ছুটে যেতে পারে গুলি !

তিনি শুধু একাই নন, পরক্ষণে দেখা গেল তাঁর পেছনে পেছনে প্রবেশ করছেন ডিটেক্‌টিভ ইন্সপেকটর মিস্টার অনাদি

মিত্র, পশুপতি ভৌমিক, এবং দুজন কনস্টেবল। মিত্র ও ভৌমিকের হাতেও উদ্যত রিভলভার।

আসামীর দিকে চেয়ে চ্যাটার্জী বললেন,—নমস্কার! কিন্তু আপনার কথা ভেবে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি! খুনী আসামীদের গ্রেফতার করাই হল আপনার কাজ। অথচ কালের কুটিল গতিতে আজ আপনাকেই গ্রেফতার করতে হচ্ছে!

তারপর মিত্রের দিকে চেয়ে বললেন,—এই নিন আপনার আসামী মিস্টার মিত্র; এবার যা করবার আপনিই করুন; আমার কাজ শেষ হল।

অনাদি মিত্র খুশীমনে আসামীর হাতে হাতকড়া এঁটে দিলেন। বেঁটে লোকটাও বাদ পড়লো না।

প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেলেও পরমুহূর্তেই আসামী প্রচণ্ড একটা নিষ্ফল আক্রোশে একেবারে ফেটে পড়লো! তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো অনুচরটার ওপর। এই কি তার চ্যাটার্জীকে হত্যা করা? মিথ্যাবাদী........রাস্কেল......ইডিয়ট...!

কিন্তু ফাঁসিকাঠের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই তার আক্রোশ ধীরে ধীরে উবে গেল!

চ্যাটার্জীর এবার প্রধান এবং প্রথম করণীয় হল প্রবীরকে উদ্ধার করা। প্রবীর যে বেঁচে আছে, তা তাঁরা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আসামী-অনুচরের কথোপকথন শুনেই বুঝতে পেরেছেন।

নীচের তলার একটা জঘন্য নোংরা ঘরে প্রবীর বন্দী ছিল। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে, এবং বন্দী দুজনকে নিয়ে চ্যাটার্জী সদলবলে আবার কোলকাতা অভিমুখে রওনা হলেন।

নিস্পন্দ ও নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে তাঁদের মোটরখানা যেন বিজয়ীর মতই হুহু করে ছুটে চললো...

ভোর হতে তখনও অনেকটা দেরি....
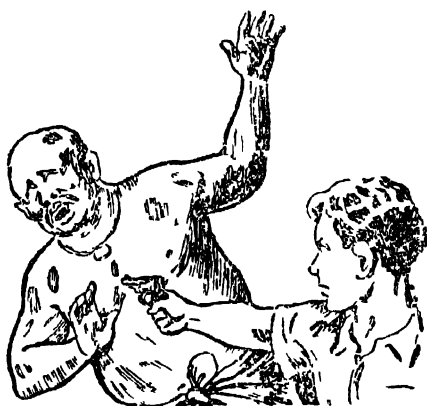
## বিশ্লেষণ

পরদিনের সুন্দর বৈকাল।

অনেকদিন পর বৈকালটা আজ সুন্দর বলে মনে হচ্ছে চ্যাটার্জীর চোখে। বেশ লাগছে আজকের আকাশটা। কেমন যেন উদার—শান্ত!

চ্যাটার্জীর সুসজ্জিত ড্রইংরুম। একখানা নতুন তৈরি করা ইজিচেয়ারে দেহ এলিয়ে দিয়ে নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে কি যেন চিন্তায় বিভোর হয়ে রয়েছেন চ্যাটার্জী। তাঁর নয়নের স্থির-অপলক দৃষ্টি জানলার ফাঁক দিয়ে আকাশের বুকে গিয়ে পড়েছে। মনে হয় তাঁর সে দৃষ্টি যেন সাত-সমুদ্দুর-তেরো-নদী পেরিয়ে কোন্ এক অচিন দেশে চলে গেছে!....

আসামীর কথাই বোধ হয় ভাবছেন চ্যাটার্জী। লোকটা সকলের কাছেই ছিলেন সরলপ্রাণ, বিশ্বাসী, কর্তব্যপরায়ণ! অমায়িক এবং কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে থানাতেও ছিল তাঁর প্রচুর সুনাম। তিনি একটা মুরগী হত্যা করেছেন, একথা সঠিকভাবে শুনলেও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হত না! অথচ সেই লোক—খুনী-আসামী-ধরা থানার সেই কর্তব্যপরায়ণ কর্মীর আজ একি মূর্তি প্রকাশ পেয়েছে?

—কি ভাবছো অসীমদা?

প্রবীর প্রবেশ করে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে।

উদাসকণ্ঠে চ্যাটার্জী বললেন,—নাঃ, ভাবছি নে কিছু। কি আর ভাববো?

—উহু! বাজে কথা বলছো! নিশ্চয়ই ভাবছিলে কিছু!

—তাই নাকি?

হাসলেন চ্যাটার্জী।

—আলবত্!

প্রবীর বসলো চ্যাটার্জীর সামনের সোফাটাতে। একটু থেমে চিন্তিতভাবে বললো,—ওঁর মতো লোক যে এতো বড় মারাত্মক অপরাধ করতে পারেন....সত্যি অসীমদা, এ যেন এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না!

—সত্যিই তাই প্রবীর! এ সব ভগবানের নিষ্ঠুর খেলা ছাড়া আর কি?

এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা না তুলে প্রবীর অনেকক্ষণ চুপ-চাপ বসে রইল। তারপর বললো,—এ বেলা মিস্টার মিত্র আর মিস্টার ভৌমিকের আসবার কথা আছে না?

—হুঁ।

আবার নীরবতা....

কথা বলতে আর ইচ্ছা করছে না। চুপচাপ বসে বসে ভাবতে ইচ্ছা করে আসামীর কথা। অদ্ভুত ছিল লোকটা। একধারে রসপ্রিয় সুন্দর অমায়িক ভদ্রলোক, অপর ধারে পিশাচের চেয়েও অধিক হিংস্র—অধিক ভয়ংকর! মানুষের টাটকা-তাজা রক্তের লোভে সে পিশাচ উন্মাদ হয়ে আছে সারাক্ষণ!

—নমস্কার মিস্টার চ্যাটার্জী!

কণ্ঠস্বরে চ্যাটার্জী দরজার দিকে চেয়ে দেখেন, অনাদি মিত্র এবং পশুপতি ভৌমিক প্রবেশ করছেন। তিনি আহ্বান জানালেন,—আসুন, আসুন। এইমাত্র প্রবীর আপনাদেরই নাম করছিল।

ভৌমিক বললেন,—তাই নাকি? আমরা এমন কি মহাপুরুষ....

তাঁর কথা শেষ হতে না দিয়েই প্রবীর বললো,—আপনারা মহাপুরুষ কি সাধারণ পুরুষ, তা অবশ্য জানি না। কিন্তু আমি যে আপনাদের নাম করছিলাম, এর মধ্যে সন্দেহের কিছু নেই। সত্যি, অনেকদিন বাঁচবেন আপনারা!

মিত্র বললেন,—ওকথা বলবেন না প্রবীরবাবু, আমরা যে রকম লোকের পাল্লায় পড়েছিলাম, ওই রকম লোক যদি দু-চার জন উদয় হন, তাহলে বাঁচার ব্যাপারে কোন গ্যারান্টি নেই জানবেন! থাপ্‌স্‌ খুনী বটে একজন!

ভৌমিক বললেন,—ওসব বাঁচা-মরার কথা এখন স্থগিত রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

চ্যাটার্জী রসিকতার সুরে বললেন,—তা না হয় রাখা গেল। এবার আপনার আগমনের হেতুটা কি জানতে পারি?

মিত্র বললেন,—ইনি এসেছেন 'গপ্পো' শুনতে।

—গপ্পো?

—হুঁ! 'গপ্পো' শব্দটা অবশ্য মিস্টার ভৌমিকের ভাষাতেই

ব্যবহার করেছি। আপনি কিভাবে এই দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করে আসামীর সন্ধান পেলেন, সেই গপ্পোই ইনি শুনতে এসেছেন। এবং আমিও।

—ওঃ, তাই বলুন! আমি ভাবলাম বুঝি কোন শাঁকচুন্নার গল্প শুনতে এসেছেন।

হোহো শব্দে হেসে উঠলেন সবাই।

চা এলো। প্রবীর পরিবেশন করে দিল সবাইকে।

চায়ের কাপে একবার চুমুক দিয়ে চ্যাটার্জী শুরু করলেন,—গপ্পো এর মধ্যে বিশেষ কিছু নেই মিস্টার মিত্র; মাত্র একদিনের ব্যাপারে সমস্ত রহস্য ভেদ হয়েছে। ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু অন্যরূপে, শেষ হল আর একরূপে। প্রথম দিনের ঘটনাটা ধরুন। খুন হয়েছিল সঞ্জয়বাবুর ভৃত্য নয়ন। কিন্তু আততায়ী সত্যই চায়নি নয়নকে খুন করতে, সে চেয়েছিল সঞ্জয়ের মৃত্যু! কিন্তু ঘটনাচক্রে হয়ে গেছে ওলট-পালট!

বিজয় অধিকারী তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন, দুই ছেলে আর ভাইপো সঞ্জয়ের নামে। বড় ছেলে হরপ্রসাদের মাথায় চাপলো দুর্বুদ্ধি। সঞ্জয় তাঁদের সম্পত্তির ভাগীদার হওয়ায় তিনি মনে মনে ভাবলেন, ঐ উড়ো উৎপাতটা তাঁদের গ্রাসে ভাগ বসায় কেন? ওটাকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তো আপদ দূর হয়!

এই কথাটা নিয়ে আলোচনা করতে-করতেই তাঁর রক্ত গরম হয়ে ওঠে। অতঃপর অনেক ভেবে-চিন্তে কোনও এক গুণ্ডাকে

দিয়ে সঞ্জয়কে হত্যা করাই তিনি সাব্যস্ত করলেন। গুণ্ডার সন্ধান পেতে তাঁর বিশেষ বিলম্বও হল না; কিষণলাল নামে এক গুণ্ডাকে হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি ঐ কাজে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু ভুল হল কিষণলালের—সঞ্জয়ের পরিবর্তে সে নয়নকে খুন করে ফিরে এলো। এবং সেইরাত্রেই তার পারিশ্রমিক বাবদ টাকা নিতে হাজির হল হরপ্রসাদবাবুর কাছে। কিন্তু হরপ্রসাদবাবু তখন তাকে টাকা দিতে রাজী হননি। কেন হননি, তা ঠিক জানি না। তবে অনুমান করছি, লোকটা যে সঞ্জয়কে সত্যই খুন করেছে, এর কোন প্রমাণ তখনো পাননি বলেই তিনি তখন টাকা দিতে রাজী হননি। এমনও তো হতে পারে, লোকটা রাস্তা থেকে খানিকক্ষণ ঘুরে এসে বলছে, "খুন করেছি, টাকা দিন!" খুব সম্ভব এই কারণেই রাজী হননি হরপ্রসাদবাবু। হয়ত বলেছিলেন, "পরে দেব।" কিন্তু কিষণলাল তাতে রাজী হল না। তার এক কথা "এখুনি টাকা চাই!" ফলে কথা কাটাকাটির সৃষ্টি হল। পরে কথা কাটাকাটি থেকে মনোমালিন্য, মনোমালিন্য পর্যবসিত হল তুমুল ঝগড়ায়। হরপ্রসাদবাবু তখন তাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন, কিষণলালও শাসিয়ে গেল যে, সে দেখে নেবে!

সেদিন রাত্রে এই ঝগড়াটাই কানে গিয়েছিল শশাঙ্কের। সে হরপ্রসাদবাবুর কাছে গেল ব্যাপারটা জানতে। হরপ্রসাদবাবু "দুঃস্বপ্ন" বলে উড়িয়ে দিলেন!

এই সময় হরপ্রসাদবাবু মাঝে মাঝে একা তেতলায় শুতেন। কিষণলালের সঙ্গে গোপন পরামর্শ চালাবার জন্যই তিনি এই পন্থা বেছে নিয়েছিলেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি চিঠিপত্রেই কাজ সারতেন। কিন্তু এমন অনেক পরামর্শ আছে, যা চিঠিপত্রে সম্ভব নয়। তাই কিষণলাল গভীর রাতে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো।

এই চিঠি দেওয়ার ব্যাপারে হরপ্রসাদবাবু নিযুক্ত করেছিলেন তাঁর ভৃত্য রতনকে। রতন অবশ্য ভেতরের ব্যাপার কিছুই জানতো না। শুধু মনিবের কথামতো শৈলেন চাটুজ্জে লেনের ৪৮নং বাড়িটায় চিঠি পৌঁছে দিয়ে আসতো।

এইবার রতনের মৃত্যুর কথাটা ভাবুন। আমার প্রশ্নের উত্তরে রতন যখন এই চিঠি দেওয়ার কথাটা উল্লেখ করতে উদ্যত হয়েছে, তখনই সে খুন হল। হরপ্রসাদবাবু আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার আর রতনের সমস্ত কথোপকথনই শুনছিলেন। যখনই দেখলেন রতন সমস্ত কথা ফাঁস করে দিতে উদ্যত হয়েছে, তখনই তিনি খুন করলেন রতনকে। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য, মৃত্যুকালে সে ৪৮নং শৈলেন চাটুজ্জে লেনের কথাটা উল্লেখ করে গেছে।

শৈলেন চাটুজ্জে লেনে গিয়ে কি যে ঘটেছিল, তা তো আপনি জানেন মিস্টার মিত্র! কিন্তু ভৌমিক জানেন না, সে কারণ ঘটনাটা আবার বলছি। অনেক খোঁজাখুঁজি করে কয়েকখানা চিঠি আমি পেয়েছিলাম ঐ বাড়িটা থেকে। চিঠি-

গুলোর মধ্যে তিনখানা চিঠি ছিল কিষণলালের নামে হরপ্রসাদ-বাবুর লেখা। চিঠি তিনখানা পড়ে সমস্ত রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। নমুনাস্বরূপ একখানা চিঠি আপনাকে দেখাচ্ছি মিস্টার ভৌমিক, পড়ে দেখুন।

মিস্টার ভৌমিক উচ্চকণ্ঠেই পড়তে শুরু করলেন :

কিষণলাল,

তুমি কেন যে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না, বুঝে উঠতে পারছি না। এ সব ব্যাপারে লেখা-লেখির আশ্রয় নিলে তোমার এবং আমার উভয়েরই বিপদের সম্ভাবনা আছে। তুমি বিশ্বাস করো কিষণলাল, এ কাজের পারিশ্রমিক বাবদ তোমাকে এক হাজার টাকাই দেব। যাই হোক, আর বিলম্ব করো না, আজ-কালের মধ্যেই আপদটাকে সরিয়ে দাও।

চিঠিতে নাম সই করা ছিল না। তবু এটা বুঝতে খুব কষ্ট হয় না যে লেখাটা হরপ্রসাদের।

চ্যাটার্জী একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন,—কিষণলালের ঘরে আরো একটা জিনিস পেয়েছিলাম, সেটা হল এক সেট দারোগার পোশাক। ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম ওই পোশাকটা দেখে। কিষণলালের ঘরে এমন সযতনে এ পোশাক রক্ষিত কেন? কিষণলাল কি এই পোশাক পরে দারোগার ছদ্মবেশে পুলিস-সমাজে বিচরণ করে? এই ভাবনাটা রীতিমত

আক্রমণ করলো আমাকে! কিন্তু তখুনি এর কোন সমাধান পেলাম না। যাই হোক বুঝলাম যে, হরপ্রসাদ হলেন আসল আসামী, আর কিষণলাল নকল!

মিত্র বললেন,—একটা ব্যাপার কিন্তু আজো বুঝতে পারিনি মিস্টার চ্যাটার্জী—আমরা যখন দরজা ভেঙে কিষণলালের ঘরে ঢুকলাম, তখন কিষণলালের সেই অন্তর্ধানের ব্যাপারটা?

চ্যাটার্জী হেসে বললেন,—ও, আপনাকে কথাটা বলিনি বুঝি? কিষণলালের ঘরে যে আলমারিটা ছিল দেখেছেন, ওইটাই গুপ্তদরজা। সুইচ টিপে সরানো যেত আলমারিটাকে। আমাদের আগমন টের পেয়ে ওইখান দিয়ে ও সরে পড়েছিল। বুঝলেন? তারপর শুনুন। এই ঘটনার পরই খুন হলেন হরপ্রসাদবাবু। আমার সমস্ত প্ল্যান চুরমার হয়ে গেল। ব্যাপারটা যে কি ঘটলো তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। তবে অনুমানে ধরে নিলাম এটা কিষণলালেরই কীর্তি! এবং আসামী কিষণলালই হোক, আর যে-ই হোক না কেন, কৌশলে শশাঙ্কবাবুর ব্যাগটা চুরি করে ফেলে রেখেছিল হরপ্রসাদবাবুর মৃতদেহের কাছে! এটা আসামীর একটা ব্যর্থ চাল!

এর পরের ঘটনা শুনুন। আমার এখানে একদিন অপর্ণা দেবী এসেছিলেন, আপনার বোধ হয় সেকথা মনে আছে মিস্টার মিত্র!

মিত্র বললেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

চ্যাটার্জী বললেন,—অপর্ণা দেবী চলে যাওয়ার পর আমরা

আসামীর পায়ের ছাপ নিয়ে আলোচনা করছিলাম—একথাও আপনার মনে পড়ে নিশ্চয়ই ?

—হুঁ।

—বেশ। আচ্ছা, এবার মনে করে দেখুন তো, কথা বলতে বলতে হঠাৎ একসময় বাইরে উঠে গেলাম, এবং করুণাবাবুকে নিয়ে ফিরে এলাম···

—হ্যাঁ, বেশ মনে পড়ছে।

—কিন্তু তখন হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছিলাম কেন জানেন ? করুণাবাবুর ছায়াটা আমার নজরে পড়েছিল। ছায়াটা কার, দেখবার জন্যই উঠে গিয়ে করুণাবাবুর দেখা পেলাম ! দেখলাম তিনি রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভাবটা এইরকম, যেন কিছু লক্ষ্য করছেন তিনি! জিজ্ঞেস করে জানলাম, আসামী নাকি রাস্তার ওপিঠের একটা পান-বিড়ির দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে আমার বাড়িটার দিকে একদৃষ্টে তাকাচ্ছিল!

আমি কিন্তু আসামীকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কই দেখছি নে তো ?

করুণাবাবু বললেন,—এই মাত্র চলে গেল !

আমি তখন সবিস্ময়ে বললাম,—অনুসরণ করলেন না কেন ?

আমার এই কথার উত্তরে দারোগাবাবু কি বললেন জানেন ? বললেন,—অনুসরণ করে শত্রুর কাছে পরাজয় স্বীকার করা ছাড়া আর কি লাভ হবে ?

তাঁর এই কথায় আমার বিস্ময়ের সীমা গেল ছাড়িয়ে! আমাকে বিস্মিত হতে দেখে করুণাবাবু আবার বললেন,—কি করবো বলুন? শত্রুর কাছে পরাজয় স্বীকার করার মতো লজ্জাকর ব্যাপার যে আর কিছু নেই মিস্টার চ্যাটার্জী!

আমি তো স্তম্ভিত! একজন কর্তব্যনিষ্ঠ দারোগার মুখে একি অসম্ভব কথা! আপনারাই বলুন একজন দারোগার মুখে কি আশা করা যায় একথা?

—না, না, কখ্খনো না!—দৃঢ়ভাবেই বলেন মিস্টার ভৌমিক।—আমিও অবাক হয়ে যাচ্ছি, একথা তিনি বললেন কেমন করে?

—যাই হোক, তারপর শুনুন।—চ্যাটার্জী আবার বলতে শুরু করেন,—করুণাবাবুর ওই কথাতে আমার কেমন যেন সন্দেহ হল! মনে হল, তিনি যেন মিথ্যা কথা বলছেন। যাচাই করে দেখা দরকার! খুনী আসামীর বিন্দুমাত্রও সন্ধান পেলে যিনি হিংস্র বাঘের মতো লাফিয়ে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, সেই করুণাবাবুর সঙ্গে এই করুণাবাবুর আকাশপাতাল ব্যবধান কেন? এ যেন অন্য কোন করুণাবাবু! না, না, এ অসম্ভব! কোথাও এক বিরাট গলদ রয়েছে এর মধ্যে! সে গলদটা তবে কি? কি?

চিন্তা করতে করতে করুণাবাবুকে নিয়ে ফিরে এলাম ড্রইংরুমে। তারপর গোপনে প্রবীরকে পাঠিয়ে দিলাম ওই পানের দোকানে ব্যাপারটার অনুসন্ধান করতে। পান-বিড়ির ওই

দোকানীর নাম নীলমণি। আমার এবং প্রবীরের সঙ্গে তার যথেষ্ট আলাপ আছে। কিন্তু প্রবীর নীলমণির কাছ থেকে সংবাদ এনে আমাকে জানালো, আসামীর মতো লম্বা চেহারার এবং ওইরূপ পোশাক পরিহিত কোন ক্রেতাই অন্ততঃ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যে তার দোকানে আসেনি, এ কথা হলফ করেই বলেছে নীলমণি।

এই সংবাদ পাওয়ামাত্র আমার বিবেক বলে উঠলো,—কিন্তু করুণাবাবু কেন এরূপ ভয়ংকর মিথ্যা কথার আশ্রয় নিলেন? এ মিথ্যা কথা বলায় কী তাঁর লাভ? তবে কি তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সঙ্গোপনে আমাদেরই কথোপকথন শুনছিলেন? তাই যদি হয় তবে কেন?

সহসা অকারণেই আমার মনে প্রশ্ন জাগলো,—তবে কি আসামীর সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ আছে? কোন ঘুষের ব্যাপার আছে কি? প্রশ্নটা মনে উদয় হতেই করুণাবাবুর লম্বা দেহটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। দেহটা যেন দপদপ করে জ্বলতে লাগলো আমার চোখের ওপর! ইনি ঠিক আসামীর মতই লম্বা; তবে কি—? দেখা যাক।

সুযোগ এসে গেল শীগগিরই।

আমি আর প্রবীর সেদিন সন্ধ্যার পর লাইব্রেরিরুমে বসেছিলাম, এমন সময় আনন্দ এসে খবর দিল করুণাবাবু এসেছেন দেখা করতে। আমি নীচে না গিয়ে আনন্দকে পাঠিয়ে দিলাম তাঁকে ওপরে নিয়ে আসবার জন্য। আনন্দ চলে যেতেই আমি

খানিকটা পাউডার নিয়ে ঘরের মেঝের ওপর এমনভাবে ছড়িয়ে দিলাম যে, যাতে বুঝতে পারা না যায়। মনে মনে যুক্তি এঁটে রাখলাম, যদি তিনি জুতা পরেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতে যান, তাহলে তাঁকে জুতা খুলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্য অনুরোধ জানাব। কেননা, তাঁর খালি পায়ের ছাপটা আমার দরকার। ওটা ড্রইংরুম নয়, কাজেই জুতা খুলে প্রবেশ করতে বললে তাঁর সন্দেহের কিছুই থাকবে না। কিন্তু আনন্দের সঙ্গেই লক্ষ্য করলাম, তিনি স্বেচ্ছাতেই জুতা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলেন।

খানিকক্ষণ কথাবার্তা চলার পর তিনি বিদায় চাইলে আমি তাঁকে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলাম। ফিরে আসতেই প্রবীরের মুখে পেলাম "শুভ সংবাদ"। অর্থাৎ বিষণলালের পায়ের ছাপের সঙ্গে পাউডার-ছড়ানো মেঝের বুকে অঙ্কিত করুণাবাবুব পায়ের ছাপ হুবহু মিলে গেছে!

এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। করুণাবাবুকে আসামী-রূপে পেয়ে আমার প্রধান কর্তব্য হল, রাতের বেলায় গোপনে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়ে তাঁর কার্যকলাপটা লক্ষ্য করা। অর্থাৎ তাঁর দলে আর কেউ আছে কিনা, অসৎ মনোভাব নিয়ে তিনি অন্য কোথাও যাওয়া-আসা করেন কিনা, এবং এসব ব্যাপারে তাঁর আগামী কিছু পরিকল্পনা আছে কিনা—এইগুলো লক্ষ্য করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁর বাড়িতে হানা দিয়ে প্রবীর ধরা পড়ে গেল। এসব কথা তো আগেই

আপনাদের বলেছি···আপনাকেও তো বলেছি মিস্টার ভৌমিক ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

চ্যাটার্জী বলতে লাগলেন,—কিন্তু প্রবীরকে আটক করেই যে তিনি ক্ষান্ত হবেন না, আমাকেও শেষ করবার চেষ্টা করবেন, এটা বুঝতে আমার কষ্ট হল না। এর পরের ঘটনা আপনাদের অজানা নয়। ল্যাবরেটরি-রুমে খড়ের তৈরী অসীম চ্যাটার্জীকে বসিয়ে রেখে রাধেশ্যামবাবুর বাড়িতে মোটর নিয়ে প্রথম দিন অপেক্ষা করতেই করুণাবাবুর অনুচরের আবির্ভাব ঘটলো। সে রিভলভারের গুলি ছুড়ে খুন করলো খড়ের অসীম চ্যাটার্জীকে! জয়লালকে পাশে লুকিয়ে রেখেছিলাম, গুলি ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আর্তনাদ করে অনুচরটিকে জানিয়ে দিল যে গুলিটা সত্যই অসীম চ্যাটার্জীর দেহে বিঁধেছে। এসব কথা তো জয়লালের মুখে আপনারাও শুনেছেন। কোন রকম আর্তনাদ না হলে আসামীর সন্দেহ হতো—তাই এই ব্যবস্থা!

ভৌমিক বললেন,—কিন্তু এখনো যেন আমি ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না মিস্টার চ্যাটার্জী!

চ্যাটার্জী বললেন,—সত্যিই একথা বিশ্বাস করবার মতো নয় মিস্টার ভৌমিক! লালবাজার থানার একজন কর্তব্যনিষ্ঠ দারোগার যে এইরূপ ভয়ংকর মূর্তি প্রকাশ পেতে পারে, এটা সত্যই ভাবতে পারা যায় না! একধারে উনি দারোগাগিরি করতেন, আর অপর ধারে চলতো তাঁর ঐরূপ হিংস্র গুণ্ডামি! কতদিন

ধরে যে তিনি এই কীর্তি চালিয়ে আসছিলেন, তা তিনিই জানেন! তবে তাঁর সুবিধা ছিল এই যে, দারোগার মুখোশে তাঁর সমস্ত কুকীর্তি ঢেকে রাখা সম্ভব হতো।

চুপ করলেন চ্যাটার্জী।

আঁধার নেমে এসেছে। আকাশের বুকে অজস্র তারা। তারাগুলোর মাঝে পঞ্চমী তিথির বাঁকা চাঁদটা দপদপ করছে। জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে নীরবে বসে রইলেন চ্যাটার্জী। বেশ লাগে তাকিয়ে থাকতে। চাঁদটাকে আজ আর কাস্তের ফলা বলে বোধ হয় না—যেন একফালি ঠাণ্ডা আলো দিয়ে গড়া… …

শেষ